ओउम्
মৌলিক পার্থক্য
লেখক - প্রফেসর রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু
অনুবাদক - পণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রী (জয়পুর, রাজস্থান)

ওম্

"হিমালয়ের চেয়েও উঁচু হল মা
সাগরের থেকে অতি গভীর হল মা
বায়ুর থেকেও গতিশীল হল মা
পরমেশ্বরের প্রথম দর্শন হল মা
মা'য়ের কখনও হয় না উপমা

কিন্তু পাষাণের মত নয় কঠোর,
কিন্তু সাগরের মতো নয় লোনা,
কিন্তু বায়ুর মতো নয় সে দেহহীন,
কিন্তু প্রভুর মত নয় সে নিরাকার,
কেনা না মা কখনও হয় না 'উপ-মা"

নাম- শ্রীমত্যা বঙ্কুবালা দেবশর্ম্মা

ক) 'মাতৃদেবো ভব"।

খ) "মাতা নির্মাতা ভবতি"।

গ) "জননী জনভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী"।

উক্ত মহাবাক্য-ত্রয়কে জীবনের পাথেয় অঙ্গীকার করে জননী জঠরে জন্ম নেওয়া আমরা ভ্রাতৃ-ত্রয় অশীতি বর্ষা বৃদ্ধা মায়ের শুভাশীর্বাদ নিয়ে তাঁরই শুভ নামে মুদ্রিত করে বহু-চর্চিত, বিচার-উত্তেজক, পাঠক-হৃদয়-রঞ্জক 'মৌলিক পাথর্ক্য' — বইখানি নর-নারায়ণের চরণে সমর্পিত করলাম।

প্রকাশক ঃ— পুত্র-বধূত্রয়

শ্রীযুক্ত লক্ষ্মণ—শ্রীমতি পরমা দেবশর্ম্মা, শ্রীযুক্ত নবকুমার— শ্রীমতি পূর্ণিমা দেবশর্ম্মা

শ্রীযুক্ত ভগীরথ — শ্রীমতি ঝুমা দেবশর্ম্মা

আর্য্যসমাজ — সাহসপুর, ইন্দাস, বাঁকুড়া

কার্ত্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ, নভেম্বর ২০১৩ খ্রীষ্টাব্দ

মূল্য ঃ- ১৫ টাকা

ওম্

প্রাক্ - কথন

মৌলিক ভেদ হল নিজস্ব শৈলীর একটি প্রথম পুস্তক। যশস্বী বৈদিক বিদ্বান পণ্ডিত ধর্মদেবজী বিদ্যামার্তণ্ড, শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদজী উপাধ্যায় এবং শ্রী স্বামী সত্যপ্রকাশজী, লেখকের এই কৃতির ভূরি-ভূরি প্রশংসা করেছেন। বৈদিক ধর্মের মহত্ত্বকে অন্যদের হৃদয়ে অংকিত করার জন্য এই পুস্তকটিকে পড়ুন এবং পড়ান। বৈদিক ধর্মের সাথে অন্য মতগুলির কি পার্থক্য আছে? এবং অন্য মতের থেকে বৈদিক ধর্ম এবং দর্শনের কি বিশেষতা আছে, এঁকে জানার জন্য ইচ্ছুক এই পুস্তকের উপর একটু দৃষ্টিপাত করুন। জটিল প্রশ্নের উত্তর বড় রোচকশৈলীতে দেওয়া হয়েছে।

শুষ্ক থেকে শুষ্ক বিষয়কে অত্যন্ত সরস করে পাঠকদেরকে হৃদয়ঙ্গম করানোতে লেখক আশ্চর্যজনক সফলতা প্রাপ্ত করেছেন। প্রত্যেক প্রশ্নের উত্তর যুক্তি এবং প্রমাণের সাথে দেওয়া হয়েছে।

পুস্তকটি একবার পড়তে শুরু করবেন তো সমাপ্ত না করে পড়া ছাড়তে মন করবে না।

প্রফেসর রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু

পুস্তকের নাম ঃ- মৌলিক পার্থক্য

লেখক ঃ- প্রফেসর রাজেন্দ্র জিজ্ঞাসু

অনুবাদক - পণ্ডিত বাসুদেব শাস্ত্রী (জয়পুর, রাজস্থান)

ওম্

মৌলিক পার্থক্য

প্রথম অধ্যায়

ঈশ্বর চর্চা

বৈদিক ধর্ম এবং অন্যান্য মত - মতান্তরগুলির মধ্যে কী পার্থক্য? এঁর উপর অনেক দিন ধরে বিচার বিমর্শ করে আসছি। আমি যা কিছু বুঝেছি বা পেয়েছি তা আমি বিচারশীল সজ্জনদের কাছে তুলে ধরছি।

প্রথম মৌলিক পার্থক্য হল যে মত-মতান্তরবাদীরা তাঁদের নিজস্ব মান্যতাগুলিকে তো মানে কিন্তু সেই মান্যতাগুলির উপর কখনও মনন করতে চায় না। মনন করার মনোবৃত্তিও নাই। অবৈদিক মতবাদীদের মধ্যে মনন করার কোন মহত্ত্বই নেই। মতবাদীদের মতগুলির মধ্যে হৃদয়ের স্থান তো রয়েছে কিন্তু মস্তিষ্কের জন্য কোন স্থান নেই।

ঈশ্বরের স্বরূপ ঃ— ঈশ্বরের স্বরূপ-কেই ধরুন না! মতমতান্তরগুলি ঈশ্বরের পূজার উপর তো বেশ জোর দিয়েছে পরন্তু ঈশ্বরের স্বরূপটি কী - এঁর উপর বিচার করা হয়ই নি। পরিণামে মূলের মধ্যেই ভুল রয়ে গেছে এবং মানব সমাজের প্রচুর অহিত এবং অনিষ্ট হয়ে চলছে।

ইসলাম এবং খ্রীষ্টান মতের মধ্যে ঈশ্বরকে একদেশী বলে স্বীকার করা হয়েছে। পৌরাণিকরাও এই ধরনের মান্যতা রাখে। এই ধরনের বিচার রাখা সত্ত্বেও সমস্ত মতবাদী লোকেরা সংসারে ঈশ্বর প্রাপ্তির জন্য পূজা, উপাসনার উপর বল দেন। উক্ত মতবাদীরা ভগবানকে চতুর্থ বা সপ্তম আকাশে, ক্ষীরসাগর বা কৈলাশ পর্বতে অবস্থিত বলে মান্যতা দেয়। যদি তাই হয়, তাহলে এখানে ভগবান কি করে পাওয়া যাবে? অভাব থেকে ভাব বা ভাব থেকে অভাব হতে পারে না। এ হল দর্শন এবং বিজ্ঞানের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। অতএব মতবাদীদের দ্বারা জগতে প্রভু-প্রাপ্তির চেষ্টা করা তাঁদের নিজেদের মান্য করা মান্যতানুসারে হল ব্যর্থ। যখন মত-মতান্তরের ঈশ্বর এখানেই নেই তাহলে জগতের মধ্যে তাঁকে কি করে পাওয়া যাবে? এই সব মতবাদীরা প্রশ্নকর্তাকে প্রশ্নের দ্বারা উত্তর চাওয়ার অধিকার দেয় না।

পৌরাণিকেরা ঈশ্বর পূজার ঢোল তো খুব পিটেন কিন্তু করেন মূর্ত্তিপূজা। এঁর নামই হল মূর্ত্তিপূজা। এ কি করে ঈশ্বর পূজা হবে? এধরনের শংকা করবে না। বেদের অনাদিবাণী পরমেশ্বরের স্বরূপকে নিম্ন শব্দে ব্যক্ত করেছে — 'ব্যাপ পুরুষঃ'—

(অথর্ব বেদ ২০/১৩১/১৭) — অর্থাৎ প্রভু হলেন সর্বব্যাপক।

"সঃ ওত প্রোতশ্চ বিভূঃ প্রজাসু - (যজুঃ ৩২/৮)

অর্থাৎ ঈশ্বর প্রাণীদের মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে রয়েছেন। সর্বব্যাপক ঈশ্বরকেই এই জগতে পাওয়া যেতে পারে। যিনি এখানে নেই তাঁকে পাবো কি করে? উপরে বলা হয়েছে যে পুরানী (পৌরাণিক), কিরাণী (খ্রীষ্টান), কুরাণী (মুসলমান) ঈশ্বরকে ক্রমশঃ ক্ষীরসাগর, কৈলাশ পর্বত, চতুর্থ অথবা সপ্তম আকাশে বিরাজমান আছেন বলে মনে করে। অতএব উক্ত মতবাদীদের ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য সেখানেই যাওয়া উচিৎ যেখানে ঈশ্বর বিরাজমান রয়েছেন। বৈদিক ধর্ম ঈশ্বরকে একদেশী মানে না; ঈশ্বর হলেন সর্বব্যাপক, সবদেশী। এই বৈদিক মান্যতাকে স্বীকার না করলে মতবাদীদের পূজা উপাসনা করা নিরর্থকই হবে।

বেদ ঈশ্বরকে সচ্চিদানন্দ, সর্বব্যাপক এবং নিরাকার বলে। ঈশ্বর সাকার হতেই পারে না। বায়ুতে, জলেতে, লোক- লোকান্তরে অনেক ছোট বড় প্রাণী আছে। এমনই অনেক জীবজন্তু আছে যাঁকে চোখে দেখা যায় না। যদি ঈশ্বরকে সাকার ভাবা যায় তাহলে ছোট ছোট কীট-পতঙ্গের শরীর নির্মাণ সাকার ঈশ্বর কি করে করেছেন। নিরাকার ঈশ্বর বড় থেকে বড় এবং ছোট থেকে ছোট শরীর অথবা পদার্থের নির্মাণ বিনা কষ্টে করতে পারেন তিনি হস্তিনী বা প্রজাপতির গর্ভে ব্যাপক রয়েছেন।

ঈশ্বর পরাশ্রিত নন ঃ— মতমতান্তরের লোকেরা ঈশ্বরকে সৃষ্টির রচয়িতা তো মানেন পরন্তু ঈশ্বরকে পর-আশ্রিত করে দেন। তাঁর সৃষ্টি তাঁর অধীনে নয়। তাঁদের দূতগণের বা পূতগণের দয়ার উপর এবং কোথাও কোথাও এটাও মানেন যে ঈশ্বর হলেন সবকিছু, ঈশ্বর যা চান তাই করেন; ঈশ্বরই সবকিছু করেন এবং কখনও এটাও বলেন যে ঈশ্বরই সব কিছু করান।

ঈশ্বর হলেন নিয়ন্তা ঃ— অনাদি বেদ ঈশ্বরকে "ঋতস্য যোনি" রূপে বর্ণিত করে। এই বিশ্ব নিয়মে বাঁধা রয়েছে। নিয়ন্তা হলেন ইশ্বর। ঈশ্বর যা চান তাই করেন- এটা বৈদিক মান্যতা নয়। ঈশ্বর যা চাইবেন তাই করতে পারেন এটি হল একটি চাটুকারিতা; দার্শনিক সত্য নয়। চাপলুসী এবং সত্যের মধ্যে কি সম্বন্ধ? মতবাদীরা ঈশ্বরের উপাসনা করে না, চাপলুসী করে। এই চাটুকারিতা প্রত্যেক প্রবুদ্ধ ব্যক্তিকে চিন্তিত করে তোলে। এক মুসলমান কবি নজীর অকবর ইলাহাবাদী এই মনোবৃত্তির উপর ব্যঙ্গ করে একটি বড় ধরনের কবিতা লিখেছেন —

জো খুশামদ করেখল্ক উসসে সদা রাজী হ্যায়।
সচতো ইহ হ্যায় কি খুশামদ সে খুদা রাজী হ্যায়।।

অর্থাৎ যে খুশামদ করে তাঁর উপর সমস্ত প্রাণী প্রসন্ন থাকে কিন্তু সত্য তো এটা, যে খুশামদ করে তাঁর উপর খুদা প্রসন্ন থাকে।

ঈশ্বর না তো সবকিছু করেন, না সবকিছু করান :— বেদ এটা মানে না যে ঈশ্বরই সবকিছু করেন, না সবকিছু তিনি করান। ঈশ্বর এবং জীবের কর্তৃত্বের উপর পরে কিছু বিচার করা হবে। এখানে এটি জানা উচিৎ যে ঈশ্বরের নিয়মগুলিকে কখনও ভঙ্গ করা যেতে পারে না। ঈশ্বর স্বয়ং ও তাঁর নিজের নিয়মগুলিকে ভাঙেন না। সৃষ্টির নিয়মকে ভেঙে দেওয়ার জীবের কুচেষ্টার পরিণাম দুঃখ পাওয়া ছাড়া আর অন্য কিছু হতে পারে না। ঈশ্বর তাঁর সামর্থের দ্বারা সৃষ্টির সঞ্চালন করেন তিনি পরের আশ্রিত নন। বেদ বলছে — "বিশ্বস্য মিষতো বশী" অর্থাৎ এই বিশ্ব তাঁর বশে রয়েছে। দূতগণের দ্বারা, বা পুতগণের দ্বারা বিশ্ব-সঞ্চালনের প্রশ্নই উঠে না। বিভিন্ন মত-মতান্তরের সাথে বৈদিক ধর্মের এটি হল একটি মৌলিক ভেদ।

ঈশ্বরের জ্ঞান এবং কর্ম :— বেদের সাথে অন্যান্য মতাবলম্বীদের মৌলিক পার্থক্য হল যে মতবাদীরা ঈশ্বরের জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে সঙ্গতি, সামঞ্জস্যকে স্বীকার করে না। মতবাদীদের মধ্যে সৃষ্টি-নিয়মের বিরুদ্ধ কথাবার্তা, চমৎকারকে নমস্কার, এবং আদি সৃষ্টিতে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের আবির্ভাবে অবিশ্বাস অথবা আজ সেই জ্ঞানকে (আদি সৃষ্টির সময় প্রাপ্ত হওয়া ঈশ্বরীয় জ্ঞান) অনুপযোগী মানা — এগুলি সব ঈশ্বরের জ্ঞান এবং কর্মের মধ্যে সঙ্গতি না মানার পরিণাম নয় তো আর কি?

ঈশ্বরের রচনা, ঈশ্বরের ঋত এবং সত্যের দর্শন — এগুলো মতবাদীদের কাছে ঈশ্বরের মহানতার প্রমান নয়। সেই প্রভুর নিয়ম ভঙ্গ বা নিয়মকে ভেঙে দেখানো অর্থাৎ চমৎকার-ই হল কোনো ব্যক্তিকে কোনো মতের মধ্যে নিয়ে আসার মুখ্য যুক্তি। মতাবলম্বীদের মধ্যে সৃষ্টি-নিয়মগুলিকে ভেঙে বা বদলে দিয়ে দেখানোর দাবি করা ব্যক্তি ধার্মিক বা আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে বড় হয়। বৈদিক ধর্মে মহানতার কষ্টিপাথর হল নিয়মের পালন, উল্লঙ্ঘন নয়। বৈদিক ঋষি ঈশ্বরের নিয়মগুলির পালন করেন, প্রভুর শাশ্বত নিয়মগুলির প্রচার করেন, ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রকাশ এবং প্রসার করেন। তাঁরা কখনও নিয়ম-ভঙ্গ করেন না। বেদ এই পথকে কল্যাণ-পথ বলে মান্যতা দেয়। ঋষির বচন হল - "সুগা ঋতস্য পন্থাঃ" (ঋক্ ৮/৩১/১৩) অর্থাৎ ঋতের মার্গ সরল হয়। বেদের আজ্ঞা হল -"ঋতস্য পথ্যা অনু" (সামবেদ ১/৫/৭/৭) অর্থাৎ ঋতের রাস্তায় চল।

যারা চমৎকারে বিশ্বাস করেন তাঁদের কাছে আমাদের প্রশ্ন হল যে চমৎকার সৃষ্টি নিয়মের অনুকূল বা প্রতিকূল? মহান আর্য দার্শনিক পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়

লিখেছেন — The occurrence of an un-natural phenomenon is a contradiction of terms. If it occurs, it is natural; if it is natural, it must occur. Then, is it anti-natural? No, who can defy nature successfully?" (Supertitions Page 13) অর্থাৎ সৃষ্টির নিয়ম বিরুদ্ধ অস্বাভাবিক ঘটনা ঘটা এটা নিজে নিজেই পরস্পর -বিরোধী কথাবার্তা। যদি ঘটিত হয় তাহলে তা হবে স্বাভাবিক এবং যদি তা সৃষ্টি নিয়মের অনুসারে হয় তাহলে এরকম হওয়াই উচিৎ। তাহলে তা কি করে সৃষ্টি নিয়ম বিরুদ্ধ হবে? না, সৃষ্টির নিয়মকে পরিবর্তিত করতে কে সফল হতে পেরেছে?

বেদের সিদ্ধান্ত হল যে ঈশ্বর হলেন নিত্য, তাঁর জ্ঞাননিত্য এবং তাঁর কর্ম ও নিত্য। যেখানে ঈশ্বরের নিয়ম ভাঙবে, মনে করো সেখানে তাঁর সত্তার অভাব আছে। একজন বিদ্বান বলেছেন — নিয়মের অভাবে আমি এটাও জানতে পারিনা যে ক্ষুধা কি করে মিটে? সম্ভব যে আজ খাওয়াতে মিটছে, কাল গান গাইতে মিটবে, পরশু কাঁদলে মিটবে।

(সর্বাধিক দুঃখ কে দেয়? যদি সংসারে সব থেকে অধিক দুঃখ দেওয়া জন্তু কেউ থাকে সে হল মনুষ্যই)

দ্বিতীয় অধ্যায়

পরমেশ্বর তো পরমেশ্বরই :— অবৈদিক মতের সাথে বৈদিক ধর্মের একটি বিশেষ মৌলিক পার্থক্য হল যে বৈদিক ধর্ম পরমাত্মাকে মনুষ্য মানে না এবং মনুষ্যকেপরমাত্মা মানে না। আমরা পরে এই কথাটিকে আরও স্পষ্ট করার জন্য বলবো যে বৈদিক ধর্মে ঈশ্বরকে নর অথবা নারী অথবা নর-পশু (যথা নরসিংহ) তৈরি করা হয়নি এবং না তো মানুষকে পরমেশ্বর অথবা পরমেশ্বরের রূপে বর্ণিত করা হয়েছে। মানুষকে পরমেশ্বরের মতো বলা, জানা এবং মানা হল অত্যন্ত হাস্যস্পদ মান্যতা।

আমরা কোন্ কোন্ মত, পন্থ বা গ্রন্থের বিবেচনার চর্চা করব? প্রবুদ্ধ পাঠক স্বয়ং পড়ে নিন্, অণ্বেষণ করে নিন্, একটুখানি বিবেক বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে নিন্ — তাহলে অবৈদিক মতবাদের ঈশ্বর বা মানুষের স্বরূপ - বিষয়ক এইসব ভ্রমোৎপাদক মান্যতা চোখের সামনেই প্রকট হয়ে যাবে। তথাপি পাঠক সংকেতরূপে কিছু জানতে চান তাই আমরা সংক্ষেপে কিছু নিবেদন করছি —

পৌরাণিক হিন্দুরা অবতারবাদের মান্যতাকে সৃজন করে প্রভুকে নরদেহধারী রূপে পরিলক্ষিত করেছে। পরমাত্মাকে পরমাত্মা থাকতে দেয়নি। সর্বত্রকে একত্রে পরিণত করে দিয়েছে। সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ তথা সর্বশক্তিমান প্রভু যখন একটি দেহতে

বন্ধ হয়ে গেল তখন সে সর্বব্যাপক থাকল কি? 'সব'- এই শব্দটির অর্থই তো থাকল না। উক্ত সম্বন্ধ বিষয়ক বিবেচনা পাঠক পুস্তকের অন্যত্র-ও পড়বেন। ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা কাম নেওয়া বা ইন্দ্রিয় সমূহের উপর আশ্রিত অবতার তো সর্বজ্ঞতাকে নিঃশেষ করেই দেয়।

এই অতি বিচিত্র মান্যতার কারণে পৌরানিকেরা মনুষ্যকে পরমাত্মা রূপে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। শ্রীরামকে, শ্রীকৃষ্ণকে মহামানবের জায়গায় পরমাত্মারূপে চিহ্নিত করে দিয়েছে। মহাত্মা বুদ্ধকে অবতার মেনে ভগবান করে দিয়েছে। মহারাজ রামচন্দ্র মাতা সীতার হরণের পর কতখানি ব্যাকুল হয়েছেন? বাল্মীকি রামায়ন পড়ে দেখুন। অন্যের সহায়তা নিয়েই শ্রীরাম মাতা সীতাকে খুঁজেছেন এবং ফিরে পেয়েছেন। পরমাত্মা তো সর্বদা পরমানন্দময়। তাঁর শোকাকুল হওয়ার প্রশ্নই উঠতে পারে না। অন্যদের কাছে মাতা সীতার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করা বা জিজ্ঞাসা করানো ব্যক্তি রাম কি সর্বজ্ঞ ছিলেন? তিনি কি সর্বশক্তিমান ছিলেন?

উত্তরের আশায় ঘুরে মরছে প্রশ্ন : — চওড়া মুখ করে এই ধরনের অনেক অনেকপ্রশ্ন যুগ যুগ শতাব্দী ধরে উত্তরের আশায় যত্র তত্র ঘুরে মরছে। পৌরাণিকেরা এইসব প্রশ্নের উত্তর কেন দেবে, কী দেবে? এইসব ভালো লোকে বা ভগবানকে ভগবান থাকতে দেয়নি এবং মানবকে মানব থাকতে দেয়নি।

'অবতার' শব্দ কে প্রয়োগে এনেছে?

এমনিতে জানা দরকার যে 'অবতার' শব্দ কে তৈরি করেছে? চার বেদ, ছয়টি দর্শন, এগারটি উপনিষদ, মনুস্মৃতি, বাল্মিকী রামায়ন এবং মহাভারতে তথা গীতাতে তো অবতার শব্দই নেই। অত্যন্ত আশ্চর্যের কথা হল যে ঈশ্বরপ্রদত্ত জ্ঞান বেদ বা আর্য গ্রন্থে না হওয়া সত্ত্বেও পৌরাণিকেরা কোটি কোটি লোকেদেরকে এই অবতারবাদের কল্পিত ভ্রম -জালে ফাঁসিয়ে রেখেছে। এবার খ্রীষ্টান মতের দিকে চলুন! বাইবেলেও পরমাত্মাকে মনুষ্য এবং মনুষ্যকে পরমাত্মা তৈরি করার চক্র উপলব্ধ হবে। আমরাই বা কী বলব? বাইবেল কেই এই বিষয়ে কিছু জিজ্ঞাসা করি। উৎপত্তির পুস্তকে স্পষ্টরূপে এসেছে —

"And god said, let us make man in our own image, after our likeness." অর্থাৎ তখন ঈশ্বর বললেন — আমরা মনুষ্যকে আমাদের স্বরূপে আমাদের মতো তৈরি করি। এবং পুণঃ পাঁচ লাইনের পশ্চাতে এই কথাটাই আবার বলা হল — " And god created man in his own image, in the image of god created he him; male and female created he them." (Genesist 26-27) অর্থাৎ তখন ইশ্বর মনুষ্যকে নিজের স্বরূপে উৎপন্ন করলেন। সে তাঁকে ঈশ্বরের স্বরূপে উৎপন্ন করলেন। সে তাঁকে নর বা নারী তৈরি করলেন।

এখন পাঠক বিচার করুন কি যখন পরমাত্মা নর বা নারীকে নিজেরই স্বরূপে উৎপন্ন করলেন তখন জানা গেল যে পরমেশ্বর ও মানুষ্যেরই মতো এবং মনুষ্য পরমেশ্বরের মতো। এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য কি রইল? এখানে এমন অনেক প্রশ্ন দেখা দিল যে তাঁর উত্তর দেওয়া কোনো পাদরী বা পোপের পক্ষে সম্ভব নয়। যে যে দুর্বলতাগুলি মনুষ্যদের মধ্যে আছে সেইগুলি god পরমাত্মার মধ্যেও আছে — একথা মানতে হবে। কারণ? মনুষ্য পরমাত্মার স্বরূপেই তো তৈরি হয়েছে। লোকেরা এটা ভাবল না যে মনুষ্যের মধ্যে তো পরমাত্মার গুণ পবিত্রতা, ন্যায়, দয়া, সর্বজ্ঞতা আসুক বা না আসুক, পরমাত্মাতে তো এঁরা মানবীয় দুর্বলতাগুলিকে চাপিয়ে দিয়েছে। এখন ঈশ্বর এই বোঝাকে বইতে থাকুক্। এঁনার যা করার ছিল তা তো করে দিয়েছেন।

ইসলাম মতের মান্যতাও প্রায় উক্ত প্রকারের। কোরাণের মতে আল্লাহ মিয়াঁজী অর্শতক্তে (আকাশস্থ তক্ত) বিরাজমান আছেন। সেই সিংহসনকে ফরিশতাগণ উপরে উঠিয়ে রেখেছে। এই আল্লার ডানদিক আছে, বামদিকে আছে, সম্মুখ আছে, পশ্চাৎ আছে। সে মুখ দিয়ে বলে। শাসকগণের মতো তাঁর দূত আছে। তাঁর সৈনিক আছে এবং তাঁকে কর্জা-ও নিতে হয়। আল্লাহ্ মিয়াঁর একটি উঁটনীও আছে। এইসব পড়ে, শুনে কে সেই আল্লাহ্‌কে সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ এবং নিরাকার বলে স্বীকার করবে?

এই ধরনেরই প্রশ্ন স্বয়ং কোরাণকারের মনের মধ্যে জেগে থাকবে, তাই কোরাণের কোনো স্থানে আল্লাহর সম্বন্ধে এটাও বলা হয়েছে যে —
''তাঁর মতো কেউ নাই" - (কুরান মজিদ সুঃ শূরা বৃ-হ)
কোরাণের এই বেদোক্ত উদ্‌ঘোষ যুক্তিসঙ্গত এবং নিত্যসত্য। এই যুগে মহর্ষিদয়ানন্দজী বৈদিক ঘোষ করে, ঈশ্বরকে যেখানে সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বাধার, অজর, অমর, অনাদি, নিত্য, পবিত্র এবং সৃষ্টিকর্তা বলেছেন সে খানে পরমেশ্বরকে 'অনুপম' ও বলেছেন। দয়ালু দয়ানন্দের এই উক্তিটি হল মৌলিক অবদান যাঁর দ্বারা জোর দিয়ে প্রভুকে 'অনুপম' বলেছে। কল্যাণীবাণী বেদে পরমেশ্বরের জন্য বলা হয়েছে —

'ন তস্য প্রতিমা অস্তি' (যজুঃ ৩২/৩)

এই সূক্তির অর্থ তো এটাই যে তাঁর কোনো প্রতিমা নাই। এই সূক্তির আরও একটি অর্থ হল যে পরমাত্মার সদৃশ কেউ-ই নাই।

এখানে আমাদের শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের একটি কথা বার বার স্মরণ আসছে। তাঁর এই বচনকে আমরা গাগরে সাগর বলে অভিহিত করব। তিনি ঋষি দয়ানন্দের অবদানের চর্চা করে কখনও লিখেছিলেন — "He has given us a bold philosophy of life. A philosophy of the reality of god, reality of man and the reality of the universe in which man has to live in His is a Philosophy of bold actions and not of ideal musings." অর্থাৎ ঋষিজী

আমাদেরকে বীরোচিত একটি জীবন-দর্শন দিয়েছেন। এক প্রভুর সত্যতার দর্শন, মনুষ্যের সত্যতার দর্শন এবং সেই ব্রহ্মাণ্ডের সত্যতার দর্শন দিয়েছেন যাঁর মধ্যে মনুষ্যকে জীবন ব্যতীত করতে হয়। সেই ঋষির জীবন-দর্শন হল সাহসপূর্ণ কার্যের দর্শন, না কি নিরর্থক চিন্তনের।

এই মার্মিক কথনের ভাব হল এই যে, বৈদিক দর্শন এবং ধর্ম ঈশ্বরকে ঈশ্বর মানে। ঈশ্বরের একটি পৃথক সত্তা আছে। এ হল একটি নিত্য সত্য । মনুষ্যের নিজস্ব সত্তা আছে। এটিও একটি অনাদি সত্য। এবং এই জগৎটিও মিথ্যা নয়, প্রকৃতি থেকে উৎপাদিত এই জগৎটিও হল এক সত্য। এই সৃষ্টি হল প্রবাহতে অনাদি। ঈশ্বর, জীব এবং প্রকৃতি এই তিনটির নিজস্ব নিজস্ব সত্তা রয়েছে। এই সত্যকে কে মিথ্যা করতে পারে?

বৈদিক ধর্ম ঈশ্বরকে মানুষরূপে পরিগণিত করে না। মানুষকে পরমেশ্বর বলে না এবং পরমাত্মা থেকে প্রকৃতিকে উৎপন্ন মানে না / অন্যান্য মতের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের এটি হল মৌলিক পার্থক্য। এই পার্থক্যকে না বুঝতে পেরে মতবাদীরা ঈশ্বর এবং মনুষ্যের সত্তা, স্বরূপ তথা জগতের উৎপত্তির বর্ণনা করতে গিয়ে সব কিছুই গণ্ডগোল করে দিয়েছে। প্রভু করুন যে, সমস্ত লোক পূর্বাগ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে এই মৌলিক পার্থক্যকে হৃদয়ঙ্গম করুক।

তৃতীয় অধ্যায়

ঈশ্বরীয় জ্ঞান

> ''অচ্ছিন্নস্যাতে দেব সোম সুবীর্যস্য রায়স্পোষস্য দদিতারঃ
> স্যাম। সা প্রথমা সংস্কৃতি বিশ্ববারা স প্রথমো বরুণো মিত্রোজ অগ্নিঃ।।
>
> (যজুঃ ৭ /১৪)
>
> হে দিব্য শক্তির ভাণ্ডার প্রভো! আমরা নিরন্তর অবাধ গতিতে প্রবাহমান তোর সুবীর্য এবং ঐশ্বর্য এবং তা থেকে প্রাপ্তব্য পুষ্টির দাতা যেন হতে পারি। সর্বপ্রথম বরণযোগ্য অথবা পাপ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া, সবকে তাপ এবং প্রকাশ দিয়ে আগে নিয়ে যাওয়া, সবাইয়ের হিত চাওয়া মিত্র কেবলমাত্র তুই-ই। আমরা তোর বিশ্ব কল্যাণ করা বিশ্বের সর্বপ্রথম সংস্কৃতি, বেদের সংস্কৃতিকে বরণ করি। আমরা ধরাধামে শান্তির সেই ধারা যেন প্রবাহিত করি।

আমরা উপরে লিখেছি যে আদি সৃষ্টিতে পরমেশ্বরের জ্ঞানের আবির্ভাবের প্রতি অবিশ্বাস অথবা আজ সেই জ্ঞানকে অনুপযোগী মানা- এই সব বিবেচনা হল ঈশ্বরের জ্ঞান-কর্ম-র সঙ্গতিকে না মেনে নেওয়ার পরিণাম।

বৈদিক ধর্মের মান্যতা হল যে পরমেশ্বর আদি সৃষ্টিতে জ্ঞানের প্রকাশ চারজন ঋষিদের হৃদয়রূপী গুহাতে (cavelike heart) করেছেন।

বেদ স্বয়ং বলছেন —

"বৃহস্পতে প্রথমং বাচো অগ্রং যৎপ্রৈরত নামধেয়ং দধানাঃ।
যদেষাং শ্রেষ্ঠং যদরিপ্রমাসীৎপ্রেনা তদেষাং নিহিতং গুহাবিঃ।।

(ঋগ্বেদ ১০/৭১/১।।)

বেদের প্রকাশ হয়েছে, বেদ অবতরিত হয়নি

মত মতান্তরবাদীরা ঈশ্বরকে একদেশী বলে স্বীকার করে। অতঃ তাঁরা জ্ঞানের প্রকাশের জায়গার ঈশ্বরীয় বাণীকে নাজিল অর্থাৎ উপর থেকে এসেছে, অবতরিত হয়েছে বলে মনে করে। খ্রীষ্টান এবং মুসলমানভাই ঈশ্বরকে চতুর্থ বা সপ্তম আকাশে বিরাজমান বলে ভাবে। এইজন্য এটা স্বাভাবিক যে তাঁরা জ্ঞানকে উপর থেকে অবতরিত মনে করে। তাঁরা এটাও মানে যে আল্লাহ্ নিজের নবীদেরকে (পয়গম্বর) নিজের দূতসমূহের দ্বারা জ্ঞান পৌছান। বেদ ঈশ্বরকে সর্বব্যাপক মানে। এই জন্য বৈদিক মান্যনুসার ঈশ্বর কোনো দূতের সহায়তা না নিয়েই ঋষিদের হৃদয়-গুহাতে জ্ঞানের প্রকাশ করেন।

পয়গম্বরবাদ এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান

ইসলাম আদি মতগুলির পয়গম্বরবাদও ঈশ্বরকে একদেশী মানার কারণে প্রাদুর্ভূত হয়েছে। পয়গম্বর শব্দের অর্থ হল সুন্দর সংবাদ নিয়ে আসে যে। সংবাদ তো দূর থেকেই আসে বা আনা হয়। নিকটবর্ত্তীকে কিছু বলা বা বোঝানোর জন্য সংবাদ পাঠানোর কী আবশ্যকতা? এ থেকে স্পষ্ট যে পয়গম্বরবাদের ভিত্তি ঈশ্বরের সর্বব্যাপকতাতে অবিশ্বাস অথবা এমন বলুন যে জগৎ থেকে প্রভুর দূরত্বের উপর স্থাপিত করা হয়েছে।

সৃষ্টি নিয়ম এবং ঈশ্বরীয় জ্ঞান

কিছু কিছু লোক আদি সৃষ্টিতে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রাপ্ত হওয়ার উপরে শংকা জাহির করেন। আমাদের উত্তর হল যে সৃষ্টি ঈশ্বরের কর্ম। বেদ হল তাঁর জ্ঞান। সৃষ্টি রচনার নিয়মই এটি সিদ্ধ করে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞানের প্রকাশ আদি সৃষ্টিতেই হওয়া উচিৎ। মনুষ্যের নিয়ম হল Necessity is the mother of invention অর্থাৎ আবশ্যকতা হল আবিষ্কারের জননী। সৃষ্টি নিয়ম হল এঁর বিপরীত। আবশ্যকতার পূর্বেই পরমেশ্বর তাঁর পূর্তির সাধন প্রদান করেছেন। যেমন —

মনুষ্যপরে জন্ম নিয়েছে; প্রথমে ধরতী, পান করার জল, শ্বাস নেওয়ার জন্য বায়ু, খাওয়া-দাওযার জন্য অন্ন, ফল, বনস্পতি, দুধালু পশুকে ভগবান তৈরি করেছেন। বাচ্চা জন্মের পরে কাঁদছে এবং পরে মায়ের স্তনে দুধ এসেছে - এরকম আমরা দেখছি না। দুধ আসার পরে বাচ্চা এসেছে। সৃষ্টির নিয়ম হল যে ভগবান প্রয়োজনের পূর্বেই তাঁর পূর্ত্তির জিনিষপত্র উৎপন্ন করে দেন। এতে কোনো পরিবর্তন বা অপবাদ নেই। এই সৃষ্টি নিয়মের অনুসারে পরমেশ্বর চক্ষু তৈরি করার পূর্বেই সূর্য তৈরি করে রেখেছেন

এই নিয়মের অন্তর্গত ভগবান যখন বুদ্ধি দিয়েছেন তখন বুদ্ধির জন্য জ্ঞানের প্রকাশও আদিসৃষ্টিতে দিয়েছেন।

আপনি বাজার থেকে কাপড় ধোয়ার মেশিন বা ইলেকট্রিকের ইস্ত্রি কিনবেন, তাঁর সাথে আপনাকে কোম্পানীর তরফ থেকে একটি Instruction Book (নির্দেশ পুস্তিকা) প্রাপ্ত হয়। এটি কি করে সম্ভব হতে পারে যে পরমাত্মা এতবড় বিশাল সৃষ্টির রচনা তো করে দিলেন পরন্তু এর উপযোগ, প্রয়োগ উপভোগের বিধি বলার জন্য নিজের নির্দেশ পুস্তকই দিলেন না।

দৈনন্দিন জীবনে জ্ঞান প্রথমে, কর্ম পরে

হঠতা, জিদ এবং দুরাগ্রহে গ্রসিত কেউ মানুক বা না মানুক, মন এবং মস্তিষ্ক সবাইয়ের এইটাই মানতে বাধ্য যে প্রথমে জ্ঞান, পরে কর্ম। ইংরেজী এবং অন্যান্য ভাষাতেও লোকেক্তি রয়েছে — Look before you leap –অর্থাৎ ভাব হোল যে কর্মের পূর্বে জ্ঞান আবশ্যক। একটি লোকোক্তি রয়েছে —

Think before you speak — অর্থাৎ প্রথমে ভাবো তারপর বল।

এই দুইটি বাক্য মানব সমাজের মধ্যে বৈদিক সিদ্ধান্তের প্রতি স্বাভাবিক অচল বিশ্বাসকে ব্যক্ত করছে। বৈদিক সিদ্ধান্ত এটাই যে, মানব যখন সৃষ্টিতে জন্ম নিয়েছে তখন তাঁদের মার্গ দর্শন এবং কল্যাণের জন্য ঈশ্বর বেদ-জ্ঞান দিয়েছেন।

কিছু লোক বিকাশবাদের দোহাই দিয়ে বলে থাকে যে মানব ধীরে ধীরে উন্নতি করেছে এবং উন্নতি করতে করতে ধীরে ধীরে জ্ঞানপ্রাপ্ত করে নিয়েছে। কেমন উল্টা কথাবার্তা!! আমরা বলছি যে উন্নতির জন্য জ্ঞান একান্ত প্রয়োজন। এঁরা বলছে উন্নতি করে জ্ঞান প্রাপ্ত করেছে। মনোবিজ্ঞান (Psychology) বৈদিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে। মনোবিজ্ঞান এটা মানে যে, প্রত্যেক মানসিক কার্যে তিনটি বস্তু কাজ করে — ১) Cognition (জ্ঞান) ২) Affection (অনুভূতি) ৩) Conation (ক্রিয়া) মনোবিজ্ঞানের এই সিদ্ধান্ত সমস্ত বিশ্বের বিচারকদের কাছে মান্য। এই সিদ্ধান্তের অনুসারে ক্রিয়ার পূর্বে অনুভূতি এবং অনুভূতির পূর্বে জ্ঞান হল আবশ্যক। যখন ক্রিয়ার পূর্বে অনুভূতি এবং অনুভূতির পূর্বে জ্ঞান হল অনিবার্য তাহলে বিনা জ্ঞানে মানব উন্নতি কি করে করল???

পরিবর্তনশীল জগতের নিয়ম হল অটল

মতবাদী আক্ষেপ করে থাকে যে পরিবর্তনশীল সংসারে পথচলার নিয়ম অর্থাৎ ঈশ্বরীয় জ্ঞানেরও সময়ে সময়ে পরিবর্তন হওয়া উচিৎ। এই ধরণের বিচারশীল-বন্ধু ভুলে যান যে কেবলমাত্র মনুষ্যের নিময়ই বদলায়। এঁর কারণ হল যে, জীব হল অল্পজ্ঞ। সর্বজ্ঞ ঈশ্বরের প্রবর্তিত নিয়ম বদলায় না। আজ পর্যন্ত একটিও সৃষ্টি-নিয়ম

বদলায়নি। সত্য না মরে, না জন্ম নেয়। সত্য তো সত্যই। সবাই মানে যে Truth never dies অর্থাৎ সত্য কখনও মরে না।

বেদ জ্ঞান হল অনাদি এবং দেশ, কালের বন্ধনের মধ্যে বাঁধা নয়। বেদ সবাইয়ের জন্য এবং সব যুগের জন্য। ইংরেজীতে ব্যাকরণের নিয়ম হল যে Direct থেকে indirect করার সময় যদি কোনো বাক্যে নিত্য সত্য বলা হয়েছে তাহলে সেই বাক্যের Tense (কাল) পরিবর্তিত হয় না। সেই বাক্য সর্বদা বর্তমান কালেই থাকবে। যথা Two and two make four. The earth moves round the sun. unity is strength ইত্যাদি ইত্যাদি। যদি জিজ্ঞাসা করা হয় এই কালকে কেন বদলানো হয় না? উত্তর পাওয়া যায় — এ সব হল Eternal Truth (চিরন্তন সত্য))। সত্য কালের সাথে বদলায় না। সে হল নিত্য নূতন। অথর্ববেদের ১০/৮/২৩ মন্ত্রে এই সিদ্ধান্তকেই প্রস্তুত করে বেদ ভগবান বলেছেন —

"সনাতন মেনাহুরুতাদ্য স্যাৎ পুনর্ণবঃ।
অহোরাত্রে প্র জায়েতে অন্যো অন্যস্য রূপয়োঃ।।

অর্থাৎ তাকে সনাতন বলা হয় যে আজও পুনঃ নূতনের মতো হয়। দিনরাত দুই একে অন্যের রূপে উৎপাদিত হয়। প্রত্যেক রবিবার নূতন। প্রত্যেক সোমবার নূতন। প্রত্যেকটি দিন নূতন পরন্তু এই দিনরাতের ব্যাপারটা কত পুরানো — তা সত্ত্বেও নূতন। কারণ? এটি হল অটল নিয়ম।

সত্য হল নিত্য, নূতনও বটে

প্রসিদ্ধ কবি Byron ও উক্ত দার্শনিক সত্যকে ব্যক্ত করে লিখেছেন — "It is strange but true; for truth is always strange; stranger than fiction." — অর্থাৎ ভাব হল যে সত্য পুরাতন হওয়ার পরেও সদৈব নূতন থাকে। একে সবাই মানে। বৈদিক ধর্ম হল পুরাতন, সনাতন। এটি ঠিক পরন্তু মানব কল্যাণে এটাই রাস্তা। যে নিত্য বদলায় তা সত্য নয়, যা সত্য নয় তা মান্য নয়, হিতকর নয়। মানবজাতির কল্যাণ এতেই যে আমরা অসত্যকে ত্যাগ করে সত্যকে গ্রহণ করি।

বাইবেলে বেদের মহিমা

এহল১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দেরকথা। পাঞ্জাবের কপূর থলা শহরের আর্য বন্ধু শ্রী সুলক্ষণ কুমারের সাথে আমাকে কেরলে বৈদিক ধর্ম প্রচারের জন্য যেতে হয়েছিল। চৈঙ্গবন্নম্-এ আমরা Seventh day Adventist church-র পাদরী শ্রীযুক্ত চাকোর (K. V. Chako) ঘরে গেলাম। শ্রী পণ্ডিত নরেন্দ্রভূষণজী তথা পণ্ডিত গোবিন্দভূষণজী সাথেই ছিলেন। শ্রী নরেন্দ্রজী চাকোর সাথে পরিচয় করালেন। ধার্মিক চর্চা আরম্ভ হল। শ্রী পাদরী মহোদয় একদম প্রশ্ন করে বললেন — Do you live in a living God? অর্থাৎ আপনারা কি জীবিত পরমেশ্বরে বিশ্বাস করেন?

আমি তৎপরতার সাথে উত্তর দিলাম — 'yes but not in an absentee — অর্থাৎ আর্য লোকেরা জীবিত পরমেশ্বর (অজর, অমর, অজন্মা, নিত্য, অনাদি, সৎ, চিৎ ও আনন্দস্বরূপ) — এ বিশ্বাস করে পরন্তু আমাদের ঈশ্বর অনুপস্থিত থাকে না। কোথাও কোনো আকাশে পাতালে, জল-পর্বতে, কোনো আসন বা সিংহাসনে বসে নেই। এই উত্তরে পাদরী মহোদয় বেশ কিছুটা ঝাঁকানি খেলেন আমি বললাম — "যদি আপনি আজ্ঞা দেন তো একটি প্রশ্ন আপনাকে জিজ্ঞাসা করি? পাদরী বললেন — জিজ্ঞাসা করুন" আমি বললাম — বাইবেলে লেখা আছে In the begining was the word and the word was with god and the word was god" (St. John, New Jestament, Chapter-1) অর্থাৎ শুরুতে শব্দ ছিল এবং শব্দ ছিল ঈশ্বরের সাথে এবং শব্দ ছিল ঈশ্বর।

পাদরী মহোদয় বললেন — হ্যাঁ, বাইবেলে এই কথা আছে। তখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম — "Word (বাইবেলের) শব্দের এখানে অভিপ্রায় কি?" পাদরী মহোদয় বললেন শব্দের অর্থ শব্দ। পুনরায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম — "আরম্ভে শব্দ ছিল — এটি বাইবেলে আছে তাহলে সৃষ্টির আদিযুক্ত শব্দ কোথায় গেল? বাইবেলকে তো যীশু দিয়েছেন। সৃষ্টির আদি শব্দ কোথায়?" পাদরী মহোদয় স্পষ্টরূপে বললেন — "আমাকে আজ পর্যন্ত কেউই এরকম প্রশ্ন করেনি। নাতো আমি কখনও এর উপর সংশয় করেছি। আমি এঁর উত্তর জানিনা।"

তখন আমি বললাম — "এঁর অর্থ আমি কি বলতে পারি?" পাদরীর আজ্ঞা পেয়ে বললাম — "বাইবেলের লেখক আর্য দর্শনের পারিভাষিক শব্দকে বোঝাতে পারেনি। বৈদিক দর্শনে বেদ-প্রমাণকে শব্দ প্রমাণও বলা হয়। শব্দ-প্রমাণ আরও হতে পারে পরন্তু শুরুতে তো স্বতঃপ্রমাণ বেদ-ই শব্দ প্রমাণ ছিল। অতঃ শব্দের অর্থ হল জ্ঞান। বাইবেলের এই কথন সত্য যে সৃষ্টির আদিতে বেদের প্রকাশ হয়েছে। এটাও বিশেষ লক্ষ্য করার যোগ্য যে বাইবেলের তিনবার word শব্দের W- কে Capital word-এ লেখা হয়েছে। অতএব এই ধর্মগ্রন্থ বেদের জন্যই এসেছে।

স্মরণযোগ্য যে শিখভাইয়েরা গুরুদের বাণীকে শব্দ বলে থাকে। গুরুবাণীর পাঠকে শব্দ কীর্তন বলা হয়। কারণ এটাই যে ঋষিদের, মুনিদের এবং বিদ্বানদের বচন সমূহকেও শব্দ-প্রমাণ বলা হয়ে থাকে। পুনঃ আমি জিজ্ঞাসা করলাম — "And the word was with god." — এঁর অর্থ কি? পাদরী মহোদয় সহজ সরলভাবে আমাকেই এঁর রহস্য বোঝানোর জন্য বললেন। আমি বললাম — "বৈদিক দর্শন এই রহস্যকে উদ্ঘাটিত করতে পারে। বেদের সিদ্ধান্তে ঈশ্বর হলেন নিত্য। তাঁর গুণ-কর্ম স্বভাব ও নিত্য। বেদ হল নিত্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান। অতঃ ঈশ্বরের জ্ঞান ঈশ্বরের সাথেই থাকবে। ঈশ্বরের কাছ থেকে তাঁর জ্ঞানকে পৃথক করা যেতে পারে না। গুণ থাকবে গুণীর মধ্যে

— এই সত্যকে সমগ্র সংসার মানে। এই সত্যকে নাস্তিকও মানে, আস্তিকও মানে।"
পাদরী মহোদয় এই উত্তর শুনে বড়ই প্রসন্ন হয়েছিলেন।

আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলাম — "And the word was god" — এঁর অভিপ্রায় কি? পাদরীজী আমাকেই রহস্য বোঝানোর জন্য আগ্রহ করলেন। আমি বললাম যে বৈদিক দর্শন এই গূঢ় কথাটিকে অতি সরলে বুঝিয়ে দেয়। আর্য ধর্মে পরমেশ্বরকে জ্ঞান স্বরূপ বলা হয়েছে। এই বিচারযুক্ত অনেক মন্ত্র বেদে পাওয়া যায়। উপনিষদেও বারবার পরমেশ্বরকে জ্ঞান-স্বরূপ বলা হয়েছে। বাইবেলের এই কথাটি ঈশ্বরীয় জ্ঞানকে ইশারা করছে। এখানে স্পষ্টরূপে বলা হয়েছে যে ঈশ্বর সৃষ্টির আরম্ভে তাঁর অনাদি জ্ঞান বেদের প্রকাশ করেছেন। বৈদিক ধর্ম থেকে বিমুখ হওয়ার ফলে, গুরু-শিষ্য পরম্পরা সমাপ্ত হওয়ার জন্য বাইবেলের লেখক Word-র অর্থকে বুঝতে পারেনি; পরিণামে বাইবেলের এই শব্দটি রহস্যময় হয়ে দাঁড়িয়েছে। যদি Word-র অর্থ শব্দ ই হয় তাহলে খ্রীষ্টানরা বলুক যে "শুরুতে শব্দ ছিল" — এর অর্থ কি? সেই শব্দ কোথায় গেল? কোথায় কেন হারিয়ে গেল? সেই শব্দ ঈশ্বরের সাথে ছিল - এঁর অর্থ তাহলে কি হবে? সেই শব্দ নিরর্থক ছিল কি সার্থক? সেই শব্দ কা'র ছিল? কার জন্য ছিল? এবং কেন বলা হয়েছে?"

নিষ্পক্ষ বিদ্বানেরা অবশ্যই সেটাকে মানতে বাধ্য হবেন যেটি আমরা বলেছি। কেবলমাত্র বেদ-ই সৃষ্টির আদিতে আবির্ভাবের ঘোষণা করে এবং অন্য কোনো গ্রন্থকেই সৃষ্টির আদিতে আসার কথা বলেনা। যুক্তি এবং প্রমাণ বেদের পক্ষেই রয়েছে। পাদরী মহোদয় সহর্ষ আমাদের পক্ষকে স্বীকার করলেন —

অনাদি বেদের সম্বন্ধে ডা. গোকুলচন্দ্র নারঙ্গ লিখেছেন — The Vedas have stood like light houses of truth and wisdom though the stress and the storms of ages and have commanded the well deserved allegiance and reverence of hosts of the wisest and holiest of men and women. All glory to those who, without any desire or hope of material gaindedicated their whole lives to the study and preservation of every syllable of those monumental works in their pristine purity." (Glorius Hinduism) — অর্থাৎ যুগযুগের ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও বেদ সত্য এবং জ্ঞানের জ্যোতি-স্তম্ভ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অনেক গুণীজনের, মুনিজনের অত্যন্ত পবিত্রাত্মা স্ত্রী-পুরুষের শ্রদ্ধা বেদের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। যাঁরা বেদের পঠন-পাঠন এবং তাঁর একএক অক্ষর বা এক এক মাত্রার রক্ষা এবং তাঁর পবিত্রতা-শুদ্ধতা কায়েম রাখার জন্য জীবন সমর্পিত করেছেন, তাঁদের যতবেশী গুণকীর্তন করা হোক না কেন তা একটুখানিই হবে।

সেই সব তপস্বীরা বেদের মধ্যে না তো মিশ্রণ হতে দিয়েছেন, না অপসারণ হতে দিয়েছেন।

ঈশ্বরের কাছে নিকটস্থ সম্বন্ধঃ কর্মফল তথা পুর্নজন্ম যাঁর দ্বারা জীবাত্মার ঈশ্বরের কাছে নিকট সু সম্বন্ধ হয়।

চতুর্থ অধ্যায়

কে পাঠিয়েছে? কা'কে পাঠিয়েছে? অন্যান্য মতের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের আর একটি মৌলিক পার্থক্য হল যে বৈদিক ধর্ম এটা স্বীকার করে যে পরমাত্মা অনাদি জীবসমূহের কর্মের ভোগের জন্য, তাঁদের কল্যাণের জন্য এই সৃষ্টির রচনা করেছেন। সমস্ত জীব তাঁর কৃতকর্মের অনুসারে সুখ-দুঃখ প্রাপ্ত করে। ন্যায়কারী এবং দয়ালু ঈশ্বর সবজীবকে তাঁর কর্মানুসারেই জন্ম দেন। প্রভু আমাদের জন্মদাতা; তাই তো তাঁকে বেদমাতা বা পিতা বলা হয়।

এমনিতে তো বাইবেল, কোরাণ ইত্যাদি ধর্মগ্রন্থ-ও ঈশ্বরকে সমস্ত সৃষ্টির রচয়িতা মানে পরন্তু মেনে নেওয়া সত্ত্বেও পৈগম্বরবাদীদের একটি বিচিত্র মান্যতা হল যে যীশু ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র। যীশুকে ঈশ্বর পাঠিযেছেন। মুলসমানেরা মানে যে আল্লাহ্ মোহম্মদকে পাঠিয়েছেন। প্রত্যেক নবী (Prophet) জোর দিয়ে বলে — "আমাকে পরমাত্মা পাঠিয়েছেন।"

সমস্ত পগম্বরেরা নিজেদের নিজেদের সময়ে ঘোষণা করেছেন — "আমার পরে আর কেউ নবী (Prophet) আসবে না।

সমস্ত পৈগম্বরেরা তাঁদের পূর্বের নবীকে পৈগম্বর তো স্বীকার করে পরন্তু সেই অতীতের; বর্তমানের নয়। যাঁরা নিজেদের নবীগনকে (Prophethood) ঘোষণা করেছে তাঁরা তাঁদের পূর্ববর্তী পরবর্তী পৈগম্বরের পৈগম্বরীকে সমাপ্ত করে দিয়েছে। আপনারা এটা বলতে পারেনঃ আসার সাথেই তাঁর পূর্বের এবং পরবর্তী নবীকে services Terminate (অপদস্থ) করে দেয়।

মোহম্মদ সাহেব যীশু, মূসা ইত্যাদিকে নবী তো মেনেছে পরন্তু এঁর লাভ কি? বর্তমানে তাঁর উপযোগ কি? তাঁর কথা এখন আর চলে না। এখন তো মোহম্মদ সাহেব কেই আল্লাহ্ মানে।

সব পৈগম্বরদের আরও একটি বিশ্বাস রয়েছে। সবাই ঘোষণা করল যে — "আমি ঈশ্বরের কাছ থেকে নবীন ব্যবস্থা, নূতন নিয়ম — নূতন পুস্তক নিয়ে এসেছি। এখন সেই সব পুরাতন নিয়ম চলবে না। জরথুষ্ট, যীশু, মূসা এবং মোহম্মদ — সবাইরের উপর ইলহাম (ঈশ্বরীয় জ্ঞান) এসেছে পরন্তু প্রত্যেকেই তাঁর পূর্বের পুস্তককে মেনেছে কেবলমাত্র বাতিল করার জন্যই মেনেছে। মোহম্মদ বললেন — এবারে কোরাণের

মত চলবে, বাইবেল থেকে নয় এবং বাইবেল তাঁর পূর্বের গ্রন্থকে ছিন্ন-ভিন্ন করে রেখে দিয়েছে। এই বিচিত্র নীতির সম্বন্ধে আমরা কোনো টি প্পনী করতে চাই না।

আমাদের তো একটাই শংকা যে হজরৎ ঈসাকে ঈশ্বর জন্ম দিলেন পরন্তু বাকী মনুষ্যাদিগকেও তো সেই উৎপন্ন করে আসছে। যদি ঈসা ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র তাহলে খ্রীষ্টান পরমাত্মাকে রোজ Heavenly Father (স্বর্গস্থপিতা) বলে কেন ডাকে?

যদি সেই প্রভু কেবলমাত্র নবীদেরকেই পাঠান তাহলে অন্যান্য মনুষ্যদেরকে কে পাঠায়? সেই ঈশ্বর পৈগম্বরদিগকেই কেন এবং কিসের জন্য পাঠান? কিছু লোক বলবেন যে পাপ এবং দুর্গুণকে নষ্ট করার জন্য পৈগম্বরকে পাঠান। এটা তো কোনো তর্ক হল না। ঈশ্বর তো সবাইকে পুণ্য কর্ম করার জন্য এবং পাপ থেকে বেঁচে থাকার সৎপ্রেরণা দেন।

যদি নবীদেরকে দিয়ে সেই সব কার্য করান তাহলে এঁতে কোনো পৈগম্বরের বিশেষতা কি রইল? কাঠপুতলীর নৃত্য ভালো কিন্তু বিশেষতা কাঠপুতলীর নয়, যে নাচায় তারই বিশেষতা।

সত্য কথা হল যে পৈগম্বরবাদের মান্যতা — অবতারবাদের মধ্য এশিয়াই সংস্করণ। বেদ-বিমুখ হিন্দুরা ঈশ্বরকে ধরতীতে এনেছে এবং পৈগম্বরবাদীরা পাপ, অনাচার এবং ধর্মের গ্লানি থেকে বেঁচে থাকার জন্য পরমাত্মাকে নিজের দূত, পূত, পৈগম্বর বা ভাইসরয় পাঠানোর জন্য বাধ্য করেছে। রাজা মহারাজালোকেরাও তো অসন্তোষ, বিদ্রোহকে শান্ত করার জন্য তাঁদের কোনো সামন্ত, সূবেদার বা সেনাপতিকে পাঠিয়ে দিত।

এইসব ধারণার আধার হল ঈশ্বর থেকে বিশ্বের দূরত্ব এবং বিশ্ব থেকে ঈশ্বরের দূরত্বের হাস্যাস্পদ এবং মিথ্যা মান্যতা।

যখন থেকে সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে এই সংসারে অনেক মহাপুরুষ জন্ম নিয়েছেন। পরেও মহাপুরুষেরা জন্ম নিতে থাকবেন। অনেক ঋষি এখন পর্যন্ত জন্ম নিয়েছেন। ভবিষ্যতেও ঋষি-মুনি জন্ম নিতে থাকবেন। এটাও ঠিক যে রোজ রোজ ঋষিরা জন্ম নেন না। পরন্তু বর্তমান পর্যন্ত যত ঋষি জন্ম নিয়েছেন তাঁদের মধ্যে একজনও আজ পর্যন্ত এরকম দাবী করেননি যে আমাকে ঈশ্বর পাঠিয়েছেন।

নাতো কোনো ঋষি আজ পর্যন্ত একথা বলেননি যে আমার জন্মের পূর্বে যে ঈশ্বরীয় জ্ঞান নিয়ম বা ব্যবস্থা ছিল সে সব বাতিল হয়ে গেছে। আমি নূতন নিয়ম নিয়ে এসেছি।

সব ঋষিরা বেদকে স্বতঃপ্রমাণ, ঈশ্বরীয় জ্ঞান, ধর্মের আদি স্রোত, ধর্মের মূল এবং নিত্য ঈশ্বরের নিত্য জ্ঞান মেনেছে। এঁর মধ্যে কোনো ব্যতিক্রম নাই।

অন্যান্য মতের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের এটি একটি বড় মৌলিক পার্থক্য। সব

ঋষিদের এটি দৃঢ় মত যে ঈশ্বরের কোনো নিয়মই বাতিল হয় না। ঈশ্বর নূতন-নূতন নিয়ম করেন না, করতে পারেন না। সেই প্রভু হল পূর্ণ। তাঁর জ্ঞানের বৃদ্ধি বা হ্রাস হতে পারে না। সেই প্রভু হলেন নির্দোষ; তাঁর প্রদত্ত বেদজ্ঞানে বা সৃষ্টি নিয়মে কোনো দোষ নেই, না ছিল না থাকবে। প্রভুর সৃষ্টিতে কোনো নূতন নিয়ম জন্ম নেয় না। মনুষ্য নব নব নিয়ম সৃষ্টি করে। মনুষ্যদের নিয়মভঙ্গ হয়, বদলায়, খারাপ হয়।

অজন্মা অনাদি প্রভুর গুণ, কর্ম এবং স্বভাব সবকিছুই হল অনাদি। তাঁর জ্ঞানও হল অনাদি — অতএব নূতন নিয়ম কোথা থেকে, কিভাবে উৎপন্ন হবে?

দুই + দুই = চার।

আগুন উপরের দিকে ওঠে। জল নীচের দিকে বয়ে যায়।

এই নিয়ম ক'বে জন্ম নিয়েছে? এঁর আবিষ্কার কে করেছে? এই নিয়মের আয়ু কতদিন?

সবাই জানে যে– এইসব নিয়ম হল অনাদি, নিত্য। যখন থেকে সৃষ্টি তখন থেকেই নিয়ম।

অন্যান্য মতের সাথে বৈদিক ধর্মের এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। যে এই সত্যকে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছে, মনে করো, সে ভ্রান্তিসমূহের ঘূর্ণিজল থেকে পার হয়ে গিয়েছে। সংসারের অগণিত ভ্রান্তিগুলির উন্মূলন এই এক সত্যকে বুঝতে পারলেই হয়ে যায়।

এই বৈদিক সিদ্ধান্তের পুষ্টিতে আমরা এটাই বলব যে মনুষ্যদের ঘরের, বাহনের, বস্ত্রের তথা অন্যান্য ভোগ্য সামগ্রীর আকৃতি (Model) তো পরিবর্তিত হতেই থাকে পরন্তু মনুষ্য, গাই, ঘোড়া, হাতী, সিংহ, সর্প, তোতা, ময়ূর যেমনটি প্রথমে উৎপন্ন হয়েছিল, ঠিক তেমনি আজও জন্ম নিচ্ছে। এঁদের আকৃতিকে কোনো পরিবর্তন হয় নাই। এঁর কারণ হল এটাই যে এঁরা সব পূর্ণ পরমাত্মার কৃতি। এ হল নির্দোষ রচনা। এঁদের আকৃতি হল দোষরহিত — এতে পরিবর্তন বা বিকাশের কোনো সম্ভাবনাই নাই। ঈশ্বরের বিধি-বিধান হল অটল। প্রভুর এক এক কৃতি (Model) এই দৃষ্টিতে পূর্ণ (Perfect)। এইজন্যই আস্তিকগণের এই মান্যতা বিদ্যমান যে পূর্ণ থেকে যা কিছু উৎপন্ন হয় বা হয়েছে তা হয় পূর্ণ অর্থাৎ দোষমুক্ত।

পঞ্চম অধ্যায়

ত্রৈতবাদ

If permanent self-hood is an illusion, the notion of duty loses all its significance অর্থাৎ যদি নিত্য জীব এক ভ্রমমাত্র হয় তাহলে কর্তব্যের মহত্ত্ব কি রইল ? (শ্রীরামানুজাচার্য)

ঈশ্বরের সত্তাকে স্বীকার করে অবৈদিক মত হল মূলতঃ অদ্বৈতবাদী। এই অদ্বৈতবাদীদের সাথে বৈদিক ধর্মের মৌলিক পার্থক্য হল যে অনাদি বেদ ত্রৈতবাদী। যদ্যপি ইসলাম এবং খ্রীষ্টানমত শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদকে মানে না তথাপি এই দুই মতের সৃষ্টি- উৎপত্তি সম্বন্ধী মান্যতা অদ্বৈতাবাদের-ই বিকৃত অদার্শনিক অথবা পরিস্কৃতরূপ। এঁরাও হল অদ্বৈতবাদী। যেমনভাবে পূর্বে বলা হয়েছে যে মতবাদীরা ঈশ্বরের স্বরূপকে বোঝার যত্নই করেনি। কেবল কল্পনার লোকে বিচরণ করেছে। সৃষ্টি উৎপত্তির বিষয়ে অবৈদিক মতগুলির অনেক ভ্রান্তিগুলির মুখ্য কারণ হল ঈশ্বর স্বরূপের যথার্থজ্ঞান না হওয়া।

অথর্ববেদে ১৩/৪/২০ মন্ত্রে পরমেশ্বরের স্বরূপের বর্ণনাকরে বলা হয়েছে — 'স এষ এক একবৃদেক এব"- অর্থাৎ সেই পরমেশ্বর হল এক; নিশ্চয়ই এক সে হল এক বৃৎ। মিশ্রন নয়। অমিশ্রিত। কেউই তাঁর থেকে হয়নি এবং না সে কারও দ্বারা হয়েছে। ব্যস্, মতমতান্তরবাদীরা মূলেই এই ভুল করে দিয়েছে যে তাঁরা বৈদিক ধর্মের এই দার্শনিক সত্যকে বুঝে উঠতে পারেনি। মতবাদীরা ''ঈশ্বরই সব কিছু — এই কল্পিত মান্যতাকে ধারণ করে এই ভ্রান্তি প্রসারিত করে দিল যে ঈশ্বর উপাদান কারণ ব্যতীতই সৃষ্টির সৃজন করে দিয়েছেন। ফারসীভাষার একজন সূফী কবি লিখেছেন—

'হর চে বীণী বদাঁ কি মজহরে ওস্ত' — অর্থাৎ যা কিছু তুই দেখছিস্ তা জেনে নে যে সব সেই পরমেশ্বরের রূপ, তাঁর থেকেই ব্যক্ত হয়েছে। ভারতের নবীন বেদান্তী তো অদ্বৈতবাদী হওয়ার কারণে ব্রহ্মের অতিরিক্ত জীবাত্মা ও প্রকৃতির সত্তাকে স্বীকার করে না। ইসলাম এবং খ্রীষ্টানমতও সৃষ্টির উপাদান কারণ প্রকৃতি এবং জীবাত্মার স্বতন্ত্র সত্তাকে মানে না। এই দুই মতের মান্যতা হল যে জীবাত্মা এবং প্রকৃতিকে ঈশ্বর জন্ম দিয়েছেন।

এই ভ্রান্তির ফলে বড় বড় বিচারশীল মানুষ নাস্তিক হয়ে গেছে। প্রত্যেকটি জিজ্ঞাসুর মনে এই শংকা জাগৃত হয় যে সৃষ্টির রচনা কিভাবে হয়েছে? মতবাদীরা উত্তর দেয় — ''পরমশ্বের জগৎ সৃষ্টি করেছেন।" যখন জিজ্ঞাসা করা হয় — ''কি দিয়ে করেছেন? ''তখন মতবাদীদের কাছ থেকে উত্তর পাওয়া যায়" ''নিজের থেকে তৈরি করেছেন অথবা নিজের শক্তি দিয়ে সে অভাব থেকে সৃষ্টির সৃজন করেছেন।" ভারতের মহান ক্রান্তিকারী, বিপ্লবী এবং বিখ্যাত বিদ্বান্ লালা হরদয়াল M.A. এই ভ্রান্তি মূলক বিচারের কারণে নাস্তিক হয়ে যান। তিনি প্রশ্ন করেছিলেন — ''যদি ভগবান সৃষ্টিকে জন্ম দিয়েছে তাহলে ভগবানকে কে জন্ম দিয়েছে? ভগবান কোথা থেকে উড়ে এলেন? তাঁর উৎপত্তি কবে হল?(Hints for self culture)

বৈদিক ধর্মের তো যুক্তিযুক্ত উত্তর হল যে পরমাত্মা, জীবাত্মা এবং প্রকৃতি, এঁরা তিনজনেই হল অনাদি। এই তিনকে কেউই জন্ম দেয়নি। প্রভু সৃষ্টির সৃজন করেছেন,

এঁকে নিজের থেকে বা অভাব থেকে জন্ম দেননি।

বিজ্ঞান আজ এই বৈদিক সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়েছে — Matter can neither be created nor it can be destroyed না প্রকৃতিকে জন্ম দেওয়া যেতে পারে, না এঁকে নষ্ট করা যেতে পারে।

মহান্ বৈজ্ঞানিক নিউটনের মতে

জগৎ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিউটনের গতির প্রথম সিদ্ধান্ত হল —" Every body continues in its state of motion or rest unless some external force is applied on it" — অর্থাৎ প্রত্যেক পদার্থ নিজের গতি বা বিরামের অবস্থায় থাকে যতক্ষন পর্যন্ত তাঁর উপর কোন বাহ্য বল কার্য না করে।

জড় প্রকৃতি হল গতিহীন। এ গতি করতে পারে না। একথা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞান দুইজনেই স্বীকার করে। পরন্তু বিজ্ঞান মানে যে সূর্য, চন্দ্র, পৃথিবী আদি সব লোক গতি করে। পরমানু (Atom) তেও গতি হয়। এই গতির কারণ কি? নিউটন বলছেন যে, যতক্ষন পর্যন্ত বাইরে থেকে শক্তি না দেওয়া যায় ততক্ষন জড়বস্তু গতি করতে পারে না। সারা সংসার হল গতিমান। পরমানুতেও গতি আছে। তাহলে বাইরে থেকে এঁদেরকে কে গতি দিচ্ছে? মানুষের মধ্যে এই সামর্থ্য তো নাই। নিউটনের অনুসারে এই গতি অন্য কেউ শক্তি দিচ্ছে। সেই শক্তি হল সর্বশক্তিমান ভগবান।

বেদ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলছে —

ওম্ তদেজতি তন্নৈজতি তদ্দূরে তদ্বন্তিকে।
তদন্তরস্য সর্বস্য তদু সর্বস্যাস্য বাহ্যতঃ।। যজু ৪০/৫//

অর্থাৎ সেই ব্রহ্ম সবাইকে গতি দিচ্ছেন পরন্তু স্বয়ং গতি করেন না। তিনি দূর থেকে দূরে, নিকট থেকে নিকটে। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের ভিতরে এবং বাইরে ব্যাপ্ত। যখন থেকে প্রকৃতি তখন থেকে পরমানুর মধ্যে গতি। প্রকৃতি কবে থেকে? বিজ্ঞান বেদের সাথে স্বর মিলিয়ে বলছে যে, প্রকৃতি উৎপন্ন হতে পারে না, নষ্ট হতে পারে না অর্থাৎ অনাদি। প্রকৃতি যখন অনাদি তখন গতি প্রদায়ক শক্তি ভগবানকেও অনাদি মানতে হবে। বৈদিক দর্শনকে ভালোভাবে বুঝতে পারলে এই প্রশ্ন কখনও জাগবেই না যে ভগবানকে কে জন্ম দিয়েছে? কবে জন্ম নিয়েছে?

বৈদিকধর্মী আমরা যখন বলি যে পরমেশ্বর আমাদেরকে উৎপন্ন করেছেন তখন উৎপন্ন শব্দের অর্থ এই নয় যে অভাব থেকে ভাব। আমরা তো এটা মানি যে যেমন কুমার মাটি দিয়ে কলসী আদি তৈরি করে। যেমন কামার লোহা দিয়ে বস্তু তৈরি করে অথবা ছুতার কাঠ দিয়ে চেয়ার, টেবিল তৈরি করে তেমনিই পরমেশ্বর অনাদি জীবাত্মাদের জন্য অনাদি প্রকৃতির দ্বারা এই সৃষ্টির সৃজন করেছেন। জন্ম কী? এঁর উত্তর মহর্ষি দয়ানন্দ দিয়েছেন — "শরীরের মধ্যে আত্মার সংযোগের নাম জন্ম এবং

বিয়োগ মাত্রকে মৃত্যু বলা হয়।" শরীর অনাদি প্রকৃতি দিয়ে নির্মিত হয় এবং এর সংযোগ অনাদি জীবাত্মার সাথে যখন হয় তখন বৈদিক ধর্মী এঁকেই উৎপন্ন হওয়া মানে বা স্বীকার করে।

মহান্ বিদ্বান্ প গুরুদত্ত বিদার্থীর বচন

যদি মেনে নেওয়া যায় যে অভাব থেকে ভাব উৎপন্ন করার শক্তি, সামর্থ্য ঈশ্বরের মধ্যে আছে তাহলে মহান্ মনীষী পণ্ডিত গুরুদত্তজী বিদ্যার্থীর শব্দে বলতে হবে — "Hence there are two kinds of nothing. Firstly, the ordinary nothing from which nothing comes out, secondly, this peculiar nothing which gives rise to something. Now what-so-ever has many kinds, is not nothing but something." (Wisdom of the Rishis, Page 261) — অর্থাৎ এই কারণ থেকে অভাব দুই প্রকারের। প্রথমতঃ সামান্য বা সাধারণ অভাব যাঁর থেকে অভাব উৎপন্ন হয়। দ্বিতীয়তঃ অদ্ভুত অভাব যাঁর থেকে কিছু ভাব (Something) উৎপন্ন হয়। এখন যখন অভাবকে দুই প্রকারের মানা হল তাহলে এটি অভাব নয়, কোনো বস্তুর ভাব হয়ে গেল।

শ্রী শংকরাচার্য ইত্যাদি কিছু ভারতীয় দার্শনিকগণের অনুযায়ীরা এই ভ্রম ছড়িয়ে রেখেছে যে বেদ আদি সত্য শাস্ত্র অদ্বৈতবাদের প্রতিপাদন করে। এরকম যাঁরা বলেন তাঁরা সত্যের নির্মম হত্যা করে থাকেন। বেদান্তশাস্ত্রের বচন হল —

"জন্মাদ্যস্য যতঃ' অর্থাৎ যাঁর দ্বারা জগতের জন্ম, স্থিতি এবং প্রলয় হয় সেই ব্রহ্ম হল জানার যোগ্য।

প্রশ্ন এটা যে যদি বেদ তথা আর্য গ্রন্থসমূহ কেবল ব্রহ্মেরই সত্তাকে মানে তাহলে ব্রহ্মের দ্বারা কা'র জন্ম হয়? স্থিতি এবং প্রলয় কা'র?

আর্য ঋষিরা ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ মেনেছে। সর্বব্যাপক মেনেছে তথা সর্বশক্তিমান মেনেছে। যদি ঈশ্বর ব্যতীত অন্য কেউ নেই বা অন্যকারও সত্তা নাই তাহলে ঈশ্বরকে সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপক তথা সর্বশক্তিমান বলা, লেখা বা মানা ব্যর্থ হবে। মহান্ আর্য মনীষী শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী এই বিচারকে ব্যক্ত করে লিখেছেন — সর্বজ্ঞতার অর্থ কী? — "What do these words omniscience, omnipres-ence and omnipolence mean?" Instead of all-knower, all present and all-powerful, you should say nothing-knower, nothing- pervader and possessor of no power. What did he know when there was nothing? Where was he present when there was nowhere? What does the superlative most powerful mean when there was none to compare with?" (Philosophy of Dayanand - Para- 118) শ্রী স্বামী সত্যপ্রকাশজীও এই প্রশ্নের উপর বিচার করে একটি সূক্ষ্মতর্ক উপস্থিত করেছেন- তিনি

লিখেছেন -- "If there is nothing to change, mould or transform, the agency which does so loses the very singificance is the changer, moulder or transformer." (A critical study of Philosophy of Dayananda - Para 261) অর্থাৎ যদি পরিবর্তিত হওয়ার, বদলানোর বা নবরূপ নেওয়ার কিছুই নাই। তবে পরিবর্তন করতে, বদলাতে বা নবরূপ দেওয়া সত্তার তো অস্তিত্বই থাকে না। এরকম সত্তার মহত্ত্বই বা কি থাকবে?

কিছু লোকেদের মধ্যে বর্তমানে অদ্বৈতবাদের নেশা চড়ে গেছে। তাঁরা ভাবে যে অদ্বৈতবাদের চর্চা করে অথবা অদ্বৈতবাদে বিশ্বাস ব্যক্ত করে সে দার্শনিকের রূপে মহিমা তথা প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত করতে পারে। তাঁরা ভাবে যে এরকম করলে দার্শনিক জগতে বাহবা পাওয়া যাবে। এরকম যাঁরা ভাবে তাঁদের কাছে ডা. সত্যপ্রকাশজী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন — "অদ্বৈতবাদীর থেকে বড় শূণ্যবাদী" If by reduction to unity, one can be a better Philosopher, perhaps the still better would be he who reduces everything to an Absolute Zero. If the object of Knowledge is non existent, why not belive in the non existence of the subject also. (A critical study of Philosophy of Dayananda. Page - 264-65

– অর্থাৎ যদি ঘটাকার একটিই সত্তাকে মানলে কেউ বড় দার্শনিক হতে পারে তাহলে সর্বদা শূণ্যবাদকে মানা ব্যক্তিও আরও বড় তত্ত্ববেত্তা হবে। যদি জানা পদার্থের কোনো সত্তা নেই তাহলে জানা, জ্ঞাতার সত্তার অভাব কেন না স্বীকার করব?

এটাও বোঝা উচিত যে যদি আমি বা আপনি (জীবাত্মা) না হই তাহলে আমার ভগবান (My God) কে বলবে?

মায়া ছাড়া ব্রহ্মের কার্য চলে না।

ভারতের অদ্বৈতবাদীরা বলে থাকেন যে ব্রহ্ম সত্য এবং জগৎ হল মিথ্যা। জগতে ব্রহ্মের অতিরিক্ত জীব বা প্রকৃতির সত্তাকে স্বীকার করা এই সব ব্রহ্মবাদীদের দৃষ্টিতে ভ্রম। পরন্তু জগতের দার্শনিক শংকার সমাধান যখন একলা ব্রহ্মের সাথে তাঁরা না করতে পারে তখন ব্রহ্মের সাথে মায়াকে খিঁচে নিয়ে আসে।

ডা. সত্যপ্রকাশজী সুন্দর লিখেছেন — Without the help of the indescribable Maya the neovedantic doctrine can not be substantiated." (A critical study of Philosophy of Dayanard) অর্থাৎ ব্যাখ্যা করা সম্ভবনয় যে মায়া, তাঁকে ছাড়া নবীন বেদান্তের সিদ্ধান্তপুষ্ট করা যেতে পারে না।

শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদজী উপাধ্যায় অদ্বৈতবাদী নবীন বেদান্তীদের মতবিষয়কে ছোট বড় অনেক দার্শনিক পুস্তকসমূহে বড় রোচক, সরল এবং সরস শৈলীতে চর্চা করেছেন। এই সব অদ্বৈতবাদীরা জগতকে মিথ্যা বা স্বপ্ন বলে অভিহিত করে। উপাধ্যায়জী লিখেছেন — **"কৃষক কৃষিকার্য করে, স্বপ্নে করে না জেগেই করে—**

"The farmer who is exercising his best energy in tilling the soil and sowing seeds, knows well that the farm is a hard reality. He knows that by sowing the seeds and pursuing tillage he will in the end get the true harvest, not illusory like a dream object. Some of our Philosophers constantly sang of their Philosophy of dream, but common people of the world turned a deaf ear to their preachings. This is all good because thus the work of the world goes on as usual on the lower strata of life. The spell of dream could grip only a few persons of higher position." (The world As We view it Page - 6) এঁর সারাংশ হল যে, কৃষক পুরা শক্তির সাথে হাল চালায়, চাষ আবাদ করে। সে ভালোভাবে জানে যে কৃষি কার্য এক কঠোর সত্য। সে জানে যে তাঁর পরিশ্রমের ফল সে এক বাস্তবিক ফসল রূপে পাবে। তাঁর পরিশ্রমের পরিণাম এক স্বপ্ন বা ভ্রমরূপে হবে না। আমাদের কিছু তত্ত্ববেত্তারা তাঁদের স্বপ্ন দর্শনের বহু রাগ গেয়েছেন পরন্তু সংসারে জন সাধারণের উপর তাঁদের কোনো প্রভাব পড়েনি। এটি ভালোই হয়েছে। এঁর দ্বারা সংসারের সারা কার্য সুচারুরূপে চলছে। কেবল কিছু উচ্চবর্গের লোকেদের মধ্যেই স্বপ্নের জাদু ব্যাপ্ত রয়েছে। সাধারণ জনতার উপর নয়।

জেগে থাকা ব্যক্তিই রাষ্ট্ররক্ষা, উপকার তথা সুধার কার্য করে স্বপ্নদেখা ব্যক্তি নয়

যে সব লোকেরা সংসার কে স্বপ্ন-ই ভেবে থাকে, তাঁদের উচিৎ যে তাঁরা খাট নিয়ে বিশ্রাম করুক। যে শয়ন করে সেই স্বপ্ন দেখে। শুয়ে থাকা লোকেরা কোনো দেশ বা সমাজের ভালোকরতে পারে না। তাঁরা অন্যায়, কলহ, খারাপ কাজ, খারাপ কর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পারে না। খারাপের সাথে যুদ্ধ জেগে থাকা ব্যক্তিই করতে পারে। শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী এই প্রসঙ্গেই লিখেছেন "Similarly if all the hardships of life are mere dream, then the best remedy is to wail for the moment that our eyes areopen and we come into the wakeful state." (The world as We View it. Page 7) — অর্থাৎ যদি জীবনের সব দুঃখ কষ্ট কেবল একটি স্বপ্ন হয় তাহলে আমাদের সেই ক্ষণের প্রতীক্ষা করা উচিৎ যখন আমাদের নয়ন খুলবে এবং আমরা জাগৃতাবস্থায় হব। ব্যক্তি এবং সমষ্টির কল্যাণ জাগরণের দ্বারাই সম্ভব হয়। জ্ঞান-মান, মর্যাদা, ধন-ধান্য সেই পায় যে জাগে। রাজনীতি শাস্ত্রে কথন হল। Eternal Vigilance is the price of liberty" — অর্থাৎ নিরন্তর জাগরণই হল স্বতন্ত্রতার মূল্য। কল্যাণবাণী বেদ বলছে -

ত্রাতারো দেবা অধিবোচতা নো মা নো নিদ্রা ঈশেত মোত জল্পিঃ বয়ংসোমস্য বিশ্বহ প্রিয়াসঃ সুধারাসো বিদথম্ আ দেবম্।। ঋক্ ৮/৪৮/১৪।

এই বেদমন্ত্রেও এই প্রার্থনাই করা হয়েছে যে বাচালতা তথা প্রমাদ যেন আমাদের উপর শাসন না করে। জীবনে সফলতা এ ছাড়া সম্ভবই নয় পরন্তু স্বপ্নবাদী এ রহস্যের কি জানে? যে সব লোক সৃষ্টির পূর্বে কেবল একমাত্র ঈশ্বরের সত্তাকেই স্বীকার করে চলে সেইসব মতবাদী লোক এই প্রশ্নের উত্তর দিতে মুশকিলে পড়ে যে যদি সৃষ্টির পূর্বে কেবল এক ঈশ্বরেরই সত্তা ছিল তাহলে সে সংসার রচনা কেন করল? কার জন্য করল? রচনার উদ্দেশ্য কি? এইসব প্রশ্নের উত্তর উক্ত মতবাদীদের কাছে একেবারেই নেই। সৃষ্টি কি নিজের জন্য করল বা অন্য কারও জন্য? যদি নিজের জন্য সৃষ্টি রচেছে তো তাতে কিসের অভাব ছিল? যদি অন্যকারও জন্য সৃষ্টি করেছে তাহলে 'অন্যরা' কে ছিল?

এই সব মতগুলিরসমস্ত মান্যতা মূলের এই ভুলের কারণে নির্মূল এবং নিস্সার, পরস্পর বিরোধী তথা অনেক সংশয়ের উৎপন্ন কর্তা। ইসলাম ও খ্রীষ্টান মত ঈশ্বরকে দয়ালু মানে কেমন দয়ালু? বৈদিক দর্শন থেকে ধার নিয়ে এই অবৈদিক মত এই শংক'র উত্তর দেয় যে পরমেশ্বর আমাদের জন্য অনেক পদার্থ উৎপন্ন করেছেন। আমাদের কল্যাণের জন্য সারা সংসার সৃষ্টি করেছেন। অতএব তিনি দয়ালু / পরন্তু প্রশ্ন পুনঃ সেটাই জাগে যে "আমাদের কল্যাণ" এটি বলার পূর্বে বলুক যে এই "আমাদের' শব্দের অর্থ কি? আমরা কে? আমরা কোথা থেকে এসে গেলাম? যখন কেবলমাত্র ঈশ্বরেরই একটি অনাদি সত্তা ছিল তাহলে আমাদের কল্যাণের চুলকানি তাঁর মস্তিষ্কে কি করে এল?

শ্রী প.গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী লিখেছেন "First create a hungry soue, then let him cry of hunger, and then provide food for him. Why all this fun? Such a belief may be a pious musing but not a Philosophy." — অর্থাৎ প্রথমে ক্ষুধার্ত জীবগণকে উৎপন্ন করে আবার তাঁদের অন্ন দেওয়া / এটা কি ধরণের কৌতুক? বাইরে থেকে এক পবিত্র বিচার হতে পারে কিন্তু এ কোন দর্শন নয়।

অন্যান্য মত এবং বৈদিক ধর্মের মধ্যে অন্য আর একটি মৌলিক পার্থক্য হলযে অবৈদিক মতগুলিতে ঈশ্বরকে সংসারের কেন্দ্রবিন্দু মানা হয়েছে। জীবাত্মার কোনো মহত্ত্ব নেই। জীবের সত্তা তো বাধ্য হয়ে মতবাদীদিগকে মানতে হয়। জীবের স্বতন্ত্র সত্তা মতবাদীরা মানে না। যখন মতবাদীদের ভগবান সৃষ্টি করে নেয় তখন জীব মাঝখানে ধাক্কার সাথে আসে বা ঢুকে যায়। বৈদিক ধর্মে প্রকৃতি ও জীবের আলাদা-আলাদা অস্তিত্ব রয়েছে। এঁদের সত্তা ঈশ্বরের উপর অবলম্বিত নয়। পরমেশ্বর হলেন সৃষ্টির কর্তা। জীব ও প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা নয়। বৈদিক দর্শনে জীবের নিজস্ব মহত্ত্ব আছে। মতবাদীদের মধ্যে জীবের স্বতন্ত্র সত্তা না হওয়ার কারণে তাঁদের মনে

অনেক প্রশ্ন এবং শংকা জাগ্রত হয় যাঁর সমাধান ওঁদের কাছে একটি ভীষণ সমস্যা। একজন ফারসী কবি লিখেছেন —

দরম্যানে কেরে দরয়া তখ্তা বন্দম করদায়ী।
বাজ মেঁ গোঙ্গ কি দামন তর মকুন হুশ্যার বাশ।।

উক্ত কবিতার ভাব হল যে, হে ভগবান্! অজগরের মত বিশাল ঢেউযুক্ত সংসাররূপী সাগরে আমার সাথে বোঝা বেঁধে দিয়ে তুই আমাকে জন্ম দিয়ে ছিস্ এবং পুনঃ বলিস্ যে সাবধান থাকিস্ — কাপড় যেন না ভিজে। অর্থাৎ সংসারে আমাদের মত দুর্বল জীবগণকে তুই জন্ম দিয়েছিস্ এবং আমাদের কাছ থেকে আশা করছিস যে আমরা যেন নিষ্পাপ থাকি — এটি তোর মূর্খতা।

পুরুষ এক বা অনেক

নবীন বেদান্তের কতকগুলি রূপ রয়েছে। শ্রী শংকরাচার্যের অদ্বৈতবাদ শ্রী স্বামী রামতীর্থের থেকে ভিন্ন। কবিবর রবীন্দ্রনাথের অদ্বৈতবাদ ডা. রাধাকৃষ্ণনের থেকে পৃথক। কিছু কিছু অদ্বৈতবাদী জীবকেই ব্রহ্মের অংশ বলে ভাবে। কিছু তো জীবকেই ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব মানে। বৈদিক ধর্মের এই মান্যতা যে পুরুষ অর্থাৎ জীব হল অসংখ্য।

একজন বিদ্বান্ লিখেছেন — "নিজের বাবদে তো কারও প্রতি সন্দেহ হতে পারে না। এই সন্দেহ-ই পৃথক সত্তার (Indirduality) প্রমাণ।"

"আমি ছাড়া আর কেউ আছে কি? সারা জীবন-ব্যবহার অনেকবাদের পোষক। লেখার জন্য সামগ্রী, জ্ঞান, কলম ও পাঠক দরকার। লেখা হয় সেইজন্য যে অন্যরা পড়বে।" "সবাইএর জীবন-যাত্রা একসাথে আরম্ভ হয়নি বা না সমাপ্তি হবে। ক্রিয়াভিন্ন ভিন্ন, ক্রিয়ার সাধন ভিন্ন ভিন্ন, স্বভাব ভিন্ন, চরিত্র ভিন্ন, কিছু কিছু জীবন অন্যের সাথে সর্বাঙ্গরূপে, প্রতিলিপি নয়।" (ডা. দীবানচন্দ কৃত দর্শন সংগ্রহ - পৃষ্ঠ ৪০-র সারাংশ) "In this world of action we start with difference, our rate of progress is different and consequently we die differently."(A critical study of Philosophy of Dayananda) — অর্থাৎ "সংসারের কর্ম ভূমিতে আমরা ভিন্নতা দিয়ে আরম্ভ করি। আমাদের প্রগতির গতিও পৃথক পৃথক এবং পরিনাম স্বরূপ আমরা ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেহত্যাগ করি।"

যদি জীব ব্রহ্মের অংশ হয় তাহলে তাঁর মধ্যে ব্রহ্মের গুণ কেন নাই? জীব হল অল্পজ্ঞ। ব্রহ্ম হল সর্বজ্ঞ। যদি জীব-ই ব্রহ্ম হয় তো পাপ কে করে? এই সব প্রশ্নের উত্তর অদ্বৈতবাদীদের কাছে নেই। জীবের স্বতন্ত্রসত্তাকে স্বীকার না করলে সংসারের রহস্যকে বোঝা সম্ভব হতে পারে না।

আজকের বিশ্বের মানবীয় অধিকারগুলির (Human Rights) বিশেষ রূপে মানবের স্বতন্ত্রতার দোহাই অনেক দেওয়া হয়। প্রত্যেক রাজনৈতিক দল ও নেতা দিনরাত স্বতন্ত্রতার রাগ আলাপ করে চলছে। স্বতন্ত্রতা কা'র জন্য? উত্তর হল মানবের জন্য। মানবের স্বতন্ত্রতার জন্য সবাই চিল্লাতে থাকে পরন্তু মানবের স্বতন্ত্রতার শ্লোগান জীবাত্মার স্বতন্ত্রসত্তার সিদ্ধান্তকে না মানলে মিথ্যা কল্পনামাত্রই হবে। মহান্ দার্শনিক শ্রী আচার্য চমূপতিজী লিখেছেন — "যদি একমাত্র পরমাত্মা সৃষ্টির কারণ হয় তো পাপের বীজ তিনিই হবেন। অতএব জীবকে অনাদি স্বতন্ত্র কর্তা মানা উচিৎ। স্বতন্ত্রতা উৎপন্ন যদি করা হয় তো সে স্বতন্ত্রতা হবে না।"

একলা প্রকৃতি এবং একলা চেতন সত্তা -
জড় প্রকৃতিতে গতি এবং ক্রম কোথা থেকে আসবে?
এবং একলা চেতনা সত্তা কা'র মধ্যে গতি উৎপন্ন করবে?

ষষ্ঠ অধ্যায়
জগতের কেন্দ্র বিন্দু

আমরা পঞ্চম অধ্যায়ে বলেছি যে বৈদিক দর্শন অথবা বৈদিক ধর্ম এই সম্পূর্ণ ব্রহ্মাণ্ডকে 'জীব কেন্দ্রিত' বলে স্বীকার করে। অন্য মতের সাথে বৈদিক ধর্মের ত্রূটি একটি মৌলিক পার্থক্য। সংসারের সমস্ত মত-পন্থ সৃষ্টিকে 'ঈশ্বর-কেন্দ্রিত' বলে মানে। যে কোনও ধার্মিক গ্রন্থকে পড়ে যান — আপনি জানতে পারবেন যে সম্পূর্ণ রচনা পরমেশ্বর নিজের ইচ্ছাতে এবং নিজের জন্যই করেছেন। যে কোনও ধর্মগুরু, ধর্মাচার্য বা বর্তমানের নবীন ভগবানদের উপদেশ, প্রবচন শুনে, পড়ে আপনারা এই সিদ্ধান্তে পৌছাবেন যে পরমাত্মা নিজের জন্যই জগৎ নির্মাণ করেছেন।

ঈশ্বরের ভক্তি, উপাসনা ও প্রার্থনার প্রয়োজন কি? আমরা পূর্বে বলে রেখেছি যে মত-পন্থীদের দৃষ্টিতে ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজন প্রভুকে প্রসন্ন করা মাত্র। আমরা নজীর আকবর এলাহাবাদীর দুটি পংক্তি উদ্বৃত করেছি। পাঠকবর্গকে অবৈদিক মতগুলি দৃষ্টিকোন হৃদয়ঙ্গম করানোর জন্য দ্বিতীয় পংক্তি পুনঃ লিখছি — "সচ্চ তো ইয়হ হ্যায় কি খুশামদ সে খুদা রাজী হ্যায়।" — অর্থাৎ তোষামোদে ভগবান প্রসন্ন হন — এটাই সত্য। এরকম ভাববেন না যে কেবল মুসলমান বা খ্রীষ্টানরাই এরকম মানে। অধিকাংশ পৌরাণিক হিন্দুগণ বা অন্য অবৈদিক মতবাদীরাও এইরকমই বিশ্বাস করে।

অবৈদিক পন্থগুলির এই ভাবনা স্বাভাবিকই বটে। যখন এঁরা এইরকম মেনে চলে যে সৃষ্টিরচনার পূর্বে কেবল একটি সত্তাই ছিল এবং সে ছিল পরমাত্মা;

তাহলে তো জগতের রচনা সে নিজের জন্যই করে থাকবে। অন্য আর কেউ তো ছিলই না যাঁর উপকার, সুধার, কল্যাণ ও উত্থান ঈশ্বরকে করতে হত। দেখুন, আমরা এখন নিজেদের তরফ থেকে কিছু না বলে একজন মুসলমান কবির দুইটি পংক্তি এখানে দিচ্ছি —

'দর্দে দিলকে বাসতে পৈদা কিয়া ইন্‌সান কো।
বরণা তায়ত কে লিয়ে কুছ কম ন থী কর্রোবিয়াঁ।।

অর্থাৎ পরমাত্মা নিজের হৃদয়ের পীড়ার জন্য (Heart disease) মানুষকে উৎপন্ন করেছে অন্যথা তাঁর সেবার জন্য তো প্রথম থেকেই অনেক ফরিশতে দেবদূত ছিল। এই বিষয়ের আরও অনেক প্রমাণ আমরা এখানে দিতে পারি পরন্তু অনাবশ্যক বিস্তার থেকে বাঁচার জন্য এতটাই পর্যাপ্ত।

আমরা অনেক কীর্তণীয়াদেরকে এমন ধরনের ভজন গাইতে শুনেছি যাতে মনুষ্যদেরকে প্রেরণা দেওয়ার জন্য বলা হয় কি হে মনুষ্য! তুই কি এই কথাটা ভুলে গিয়েছিস যে জন্মের পূর্বে মাতার গর্ভে তোকে উল্টা টাঙ্গিয়ে রাখা হয়ে ছিল। তখন এসব যাতনা সহ্য করে তুই প্রভুকে আশ্বাসন দিয়েছিলি যে আমি নরদেহ পেয়ে তোর ভজন করব। এঁর অর্থ কি? এটাই কি পরমেশ্বর আমাদের ভক্তির ক্ষুধার্ত ভিখারী। প্রভু তাঁর স্তুতি শোনার জন্য আমাদের মতো মনুষ্যগণকে গর্ভাবস্থাতে উল্টা টাঙিয়ে যাতনা দিয়ে ভক্তি ভজনের আশ্বাসন নিয়েছিলেন।

এ সব হল কপোলকল্পিত কথাবার্তা। বেদশাস্ত্র, উপনিষদ ও গীতা আদিতে উল্টা টাঙিয়ে ''ভক্তি করব' এরকম আশ্বাসন নেওয়ার কোনো প্রমাণ বা সংকেত আমরা তো পাইনা।

বৈদিক মান্যতা হল যে স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনার প্রয়োজন আত্মোন্নতি। আমরা আত্ম-শান্তি, আত্ম-সুধার এবং কল্যাণের জন্য ভক্তি করি। পূর্ণ পরমাত্মাকে আমাদের ভক্তির কোনোই প্রয়োজন নাই। ঈশ্বর জগতে কেবল মনুষ্যকেই তো উৎপন্ন করেননি; জল, বায়ু, নদী, পর্বত, পশু, পক্ষী, বনস্পতি, সূর্য, চন্দ্র ইত্যাদি সবাইয়ের নির্মাণ করেছেন। এসব পদার্থের কাছ থেকে প্রভু কী লাভ প্রাপ্ত করেন?

এসব পদার্থের উপযোগ, প্রয়োগ তথা দুরুপযোগ মনুষ্যই তো করে। অন্য জীব জন্তুও সৃষ্টির উপযোগ করে। জগৎ রচনাতে পরমাত্মার কোনো স্বার্থ নেই। এইজন্য এরূপ বলা যে তিনি মনুষ্যকে গর্ভাবস্থাতে উল্টা টাঙিয়ে ভক্তি করার আশ্বাসন নিয়েছেন — এটি সর্বদা নিরর্থক। ঈশ্বর সব কিছু দিয়েছেন; এইজন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করাটাও আত্মোন্নতির সাধন। ভক্তি ভজন দুর্গুণ, দুর্বলতাকে দূর করার জন্য। ঈশ্বরের গুণকীর্ত্তন করা হল ভক্তে গুণ কর্ম স্বভাবের সুধারের জন্য — না কি ভগবানকে প্রসন্ন করার জন্য। সেই প্রভু না তো রুষ্ট হয়, না কখনও

বিরক্ত হয় এবং না প্রার্থনা শুনে ফুলে ঢোলে হয়ে যায়। তিনি তো পূর্ণ। তিনি পরমানন্দ। তিনি হলেন এক রস। তাঁর মধ্যে মানবীয় দুর্বলতা নেই। সেই সচ্চিদানন্দ স্বরূপের উপর মানবীয় দুর্বলতাকে চাপানো মনুষ্যদের ভয়ংকর ভুল।

বেদ কার জন্য? মনুষ্যদের কল্যাণের জন্য। যজ্ঞ হবন কাদের জন্য? জীব-সমূহের কল্যাণের জন্য। জগতের ভোগ কা'র জন্য? জীব সমূহের জন্য। প্রকৃতিও তো নিজরূপে পূর্ণ। প্রকৃতির মধ্যে জ্ঞান নাই। না সুখ আছে, না দুঃখ আছে। প্রকৃতিরও কোনো জিনিষের দরকার নাই। প্রকৃতির অস্তিত্বের সার্থকতা এতেই যে জীব এঁর উপভোগ করে। পরমাত্মার অস্তিত্বের সার্থকতা এতে যে সে স্বভাবে উপকার করে। মনুষ্য তাঁর উপাসনার দ্বারা মোক্ষের পরমানন্দকে প্রাপ্ত করতে পারে। তাঁর সদ্ জ্ঞান বেদ আমাদিগকে ত্রিপাপ থেকে বাঁচিয়ে দেওয়া ঔষধি। এইভাবে আমরা দেখছি যে বৈদিক ধর্ম "ঈশ্বর কেন্দ্রিত নয়।" এ হল "জীব কেন্দ্রিত।" অন্যান্য মতের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের এটি একটি মৌলিক পার্থক্য।

এ মহর্ষি দয়ানন্দের একটি মৌলিক চিন্তন যে তিনি আমাদের সামনে বৈদিক ধর্মের এই বিশেষতাকে উপস্থাপিত করেছেন এবং শ্রী পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়ের এই উপকারের বর্ণনা আমরা কি কি শব্দে করব যিনি করুণাসাগর দয়ানন্দের এই অবদানের প্রতি মানব সমাজের ধ্যান আকৃষ্ট করেছেন। তিনি তাঁর অদ্ভুত শৈলীতে বৈদিকধর্মের এই মর্মকে আমাদিগকে হৃদয়ঙ্গম করিয়েছেন। আর্যসমাজের লোকেরা ঋষির তপ, ত্যাগ, বলিদান, যোগবল তথা অপূর্ব বিদ্বত্তাকে স্কুল কলেজের ইঁট এবং ভবনের পর্যায় প্রচারিত করে দিয়েছেন। এ এমন একটি পাপ যাঁকে আমরা ঋষির হত্যা বলে অভিহিত করব। দয়ালু প্রভুর অপার দয়াতে প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী এক দার্শনিক রহস্য, এক গূঢ় পরন্তু সরল সত্যের প্রকাশ আমাদের উপর করে দিয়েছেন। আমার মনে হয় এবারে কাউকেও বা কারও মধ্যে এই ভ্রান্তি হবে না যে ঈশ্বর নিজের জন্য সৃষ্টি রচনা করেছেন। সমস্ত লোকেদের পূর্বাগ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে এটি স্বীকার করতে সংকোচ করা উচিৎ নয় যে জগতের কেন্দ্রবিন্দু জীবাত্মা; না কি পরমাত্মা।

মানুষের সব থেকে বড় দোষ কী?
মানুষের সবথেকে বড় দোষ এই যে সে প্রত্যেক বস্তুকে 'নিজের জন্যই তৈরি হয়েছে' এটা ভেবে নেয়।

সপ্তম অধ্যায়

ঈশোপাসনা

সমস্ত আস্তিকবাদী মত পন্থ ঈশ্বরের উপাসনা, প্রার্থনা তথা পূজার উপর বল দেয়। বৈদিক ধর্মেও স্তুতি, প্রার্থনা তথা উপাসনার বিশেষ মহত্ত্ব রয়েছে। একজন আস্তিকবাদী

ব্যক্তির কাছ থেকে এটা আশা করা যায় যে সে রোজ ঈশ্বর বন্দনার জন্য কিছু সময় অবশ্যই দিয়ে থাকবেন। আমরা প্রার্থনা উপাসনা বিষয়ক মতপন্থীদের এবং বৈদিক ধর্মের দৃষ্টিকোণের উপর ষষ্ঠ অধ্যায়েও কিছু বিচার করে এসেছি। ঋষি দয়ানন্দের শিষ্য পরম্পরার একজন গম্ভীর বিচারক, লেখক এবং স্বাধীনতা সেনানী শ্রী প. ভীমসেনজী বিদ্যালংকার একবার তাঁর এক লেখাতে লিখেছিলেন যে ঋষি দয়ানন্দ তাঁর সদ্‌গ্রন্থে যত্রতত্র ঈশোপাসনার উপর বড় বল দিয়েছেন। ঋষির দৃষ্টিকোন তথা চিন্তনের বিশেষতা হল যে তিনি প্রার্থনার প্রয়োজন অন্যান্যদের তুলনায় অনেক পৃথক বলেছেন।

প্রায়ঃ ভক্তলোক নিজেদের দুঃখব্যথা নিয়ে ঈশোপসনা করে। দুঃখতাপে পীড়িত মানব হৃদয় প্রভুর কাছ থেকে কিছুনা কিছু দাবী করে ভক্তি ভজন করে। এঠিক যে দুঃখী জীব পরমপিতার কাছে, পালনকর্তার কাছে, সৃজনকর্তার কাছে, ভর্তার কাছে, দীনবন্ধু করুণাসিন্ধুর কাছ থেকেই ত্রিপাপের নিবারণের জন্য বিনতী করবে পরন্তু এটাও একটি সত্য যে এই ধরণের বিনয়কে বা এমন ধরণের ভক্তিকে কোনো বিশেষ উৎকৃষ্ট বলে বলা যেতে পারে না।

এই ভাবকে নিয়ে কবিরত্ন প্রকাশজী উপাসনার উচ্চ বৈদিক আদর্শকে নিম্নপংক্তিতে প্রস্তুত করেছেন —"ম্যাঁয় তুঝসে তুঝে প্রানধন চাহতা হুঁ।" কুঁবর সুখলালও কখনও এইভাবকেই নিম্ন পদ্যে ব্যক্ত করেছিলেন —

"নহীঁ কোঈ ভী চাহনা ঔর দিল মেঁ,
তুঝে চাহতা হুঁ এহি চাহনা হ্যায়।।

আমরা স্বীকার করি যে বেদে অন্ন, ধন, বল, পৌরুষ, তেজ, ওজ, রত্ন, গোধন এবং সন্তানের জন্যও অনেক প্রার্থনা রয়েছে পরন্তু বেদে এঁর থেকেও মহত্বপূর্ণ আত্মবল, আত্মোন্নতি, হৃদয়ের নির্মলতা, বুদ্ধির পবিত্রতা, দুর্গুণ-ত্যাগ, নির্ভয়তা, বীরতা, সৎকর্ম, পরোপকার তথা গুণসম্পন্নতার জন্য প্রার্থনা উপলব্ধ হয়।

সারা সংসার জানে

সংসারের সমস্ত সুপঠিত এবং প্রবুদ্ধ নাগরিক এটা জানেন যে বৈদিক ধর্মে গায়ত্রী মন্ত্রকে গুরুমন্ত্র বা মহামন্ত্র বলা হয়। বেদের কোনো মন্ত্রকেই ছোট বা বড় বলা যেতে পারে না। বেদের এক একটি শব্দ ঈশ্বর প্রদত্ত এবং মানবের কল্যাণের জন্য তথাপি গায়ত্রী মন্ত্রে বিশেষ মহিমা কেন? এই জন্য যে এই মন্ত্র হল মহামন্ত্র কারণ এই মন্ত্রে সৎরাস্তায় নিয়ে যাওয়ার জন্য, সৎকর্মের কারণ হওয়া সদ্‌বুদ্ধি প্রভুর কাছে চাওয়া হয়েছে।

সংসারে অনেক ধনবান নিজের সন্তানের জন্য অপার সম্পদা, কলকারখানা, বানিজ্য ব্যাপার, ভূমি, অট্টালিকা, দোকান সবকিছু ছেড়ে ইহলোক ত্যাগকরে পরন্তু

নির্বুদ্ধি, মলিন বুদ্ধি যুক্ত, দুর্ব্যসনী সন্তান সব কিছু লুটিয়ে কাঙাল হয়ে যায়। এঁর বিপরীত বিশ্ব ইতিহাস এমন সব পুরুষার্থী গুণীজনের কাহিনীতে পূর্ণ ভরে আছে যে কাঙাল পরিবারে জন্ম নিয়েছে পরন্তু নিজের সূক্ষ্মবুদ্ধি তথা পুরুষার্থের দ্বারা লক্ষ্মীপ্রাপ্ত করে লক্ষ্মীবান হয়ে গেছে।

ঋষি দয়ানন্দ 'বিশ্বানিদেব' মন্ত্রটিকেও বিশেষ মহত্ত্ব দিয়েছেন। এতেও দুর্গুণের ত্যাগ এবং সব প্রকারের সদ্‌গুণের প্রাপ্তির জন্য প্রভুরকাছে প্রার্থনা করা হয়েছে। আটটি প্রার্থনা মন্ত্রের মধ্যে উক্ত মন্ত্রটিকে সর্বাগ্রে রেখেছেন।

এটি অন্যান্য মতবাদীদের সঙ্গে বৈদিক ধর্মের একটি মৌলিক পার্থক্য। শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতাতে এসেছে —

চুতর্বিধ ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽ র্জুন। আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ।। (গীতা ৭।১৬।।)

অর্থাৎ চার প্রকারের ভাগ্যশালী লোক আমার ভজন করে। সর্বপ্রথম তো আর্ত = দুঃখীজন দুঃখমুক্ত হওয়ার জন্য ভক্তি করে। ফের জিজ্ঞাসু ব্যক্তি আমার ভজন করে। তৃতীয় শ্রেণীর লোক অর্থার্থীলোকেদের এবং চতুর্থ শ্রেণীর ভক্ত হল জ্ঞানী ধ্যানী লোক।

এই চার শ্রেণীর লোক ভজন তো করে। এটা আমাদের কাছেও মান্য পরন্তু হওয়া তো উচিত এটা ছিল যে জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানীর স্থান প্রথমে হত। আর্ত তথা অর্থার্থীর কথা পরে হত। বিপত্তির সময় তো সবাই ভগবানকে ডাকে। সেই নর হল উত্তম যে সুখ সুবিধাতেও তাঁকে না ভুলে।

ঋষি দয়ানন্দতো দারুণ করে দিয়েছেন যখন স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনার ফল এইরকম বলেছেন — ১) ঈশ্বরে প্রীতি, তাঁর গুণ, কর্ম স্বভাব দিয়ে নিজের গুণ, কর্ম স্বভাবকে ঠিক করা ২) নিরভিমানতা, উৎসাহ এবং সহায় প্রাপ্ত করা ৩) পরব্রহ্মের সাথে মিলন এবং তাঁর সাক্ষাৎকার (সত্যার্থপ্রকাশ — সপ্তম সমুল্লাস)

পূর্বেও এক অধ্যায়ে এ বিষয়ে চর্চা করেছি। এখানে এঁকে দ্বিতীয়বার বলার প্রয়োজন এই যে পাঠকদের হৃদয়ে এটি অংকিত হয়ে যাক্ যে বৈদিক ধর্মে প্রার্থনার বিশেষতা এটি যে এখানে জীবন-নির্মাণ হল বৈদিক ভক্তির প্রয়োজন । আত্মশুদ্ধির উপর এখানে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। আমরা গীতার শব্দাবলীতে বলতে পারি যে নিষ্কাম ভক্তিকে প্রাথমিকতা দেওয়া হয়েছে।

এটা ভুলে যাওয়া ঠিক নয় যে বেদ লোকের তিরস্কার করে অপিতু লোক তথা পরলোক দুইটির সুধারের উপর জোর দেয়। লোককে পরলোকের সাথে জুড়ে দেয়। বলুন — সত্য, সংযম, অপরিগ্রহ, অহিংসা পালন ব্যতীত কোন ব্যক্তি বা জাতির লোক তৈরি হতে পারে? শৌচ, সন্তোষ তথা স্বাধ্যায় লোক এবং পরলোক দুইটিকে

তৈরি করার নিয়ম। সারাংশ হল যে বৈদিক ঈশ্বর-বন্দনা উপাসকের মধ্যে এক নবীন উর্জা এবং স্ফূর্তির সঞ্চার করে। এখানে দেওয়া নেওয়া বা সৌদাবাজী নেই।

খ্রীষ্টান ভাই তো তাঁর প্রার্থনাতে প্রথমে রুটি চায়। মুসলমান বন্ধু কোরাণের আরম্ভিক বাক্য — ''বিস্মিল্লাহ' (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র নামে) জানেন কোথায় প্রয়োগ করে? সমস্ত বিশ্ব জানে যে মূক পশু, পক্ষী, মাছ ইত্যাদি জন্তুদের কে খাওয়ার জন্য কাটার সময় মুসলমান 'বিস্মিল্লাহ'ই পড়ে। এথেকে স্পষ্ট যে কোরাণকে যে শব্দে আরম্ভ করা হয়েছে — সেই শব্দ পেটের প্রার্থনাতে পরিবর্তিত হয়ে গেছে।

এটি ঈশ্বর বা কোরাণের সাথেও ঘোর অন্যায়। কোরাণের একটি ভাষ্য 'ফতহ-উল-হমীদ'-র ভূমিকাতে এরই উপর ব্যঙ্গ করে কোনো মুসলিম কবির একটি পদ্য দেওয়া আছে। সেই পদ্যের দ্বিতীয় লাইন হল —

''তুম ছুরী ফেরভী দো নাম খুদা কা লেকর'' - এটি দৃষ্টি কোনের একটি মৌলিক ভেদ। বৈদিক ঈশ্বর বন্দনা পেটকে, অর্থকে, লৌকিক কামনাকে মহত্ত্ব দেয় পরন্তু প্রধানতা, প্রাথমিকতা তথা মুখ্যতা দেয় না।

এখানে ঈশ্বরকে ভালোবাসার কারণ হল ঈশ্বরের গুণাবলী। সেই প্রভু হল পূর্ণ, আনন্দ স্বরূপ, শুদ্ধ, পাপরহিত। এই জন্য তাঁর স্তুতি, প্রার্থনা, উপাসনার দ্বারা জীব আত্মোন্নতি করে মোক্ষকে প্রাপ্ত করে।

ঋষি দয়ানন্দ বৈদিক সন্ধ্যাতে বৈদিক জীবনের দৃষ্টিকোণকে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চারটির স্ব-স্ব মহত্ত্ব রয়েছে। পরন্তু প্রার্থনা স্বার্থস্বরূপ হওয়া উচিৎ নয়। কিছু কিছু লোক তো ভক্তিকেই হাস্যাস্পদ করে রেখেছে। লোক প্রার্থনা তো কি করবে, পরমাত্মার সামনে নিজের চাওয়ার লিস্ট ধরে দেয়। কিছু লোক তো আরও আগে গিয়ে নিজেদের আত্মীয় স্বজনদের বিয়োগের পর তাঁদের সদ্‌গতিরও প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে করে, করায়। স্মরণ রাখবেন — বেদনুসার প্রার্থনা কোনো সুপারিশের চিঠি নয়। আমাদের কথাতে পরমাত্মা আমাদের আত্মীয় স্বজনদের কৃতকর্মকে না দেখে তাঁকে না তো ভালো জন্ম দেবে এবং না কোনো পাপীকে সদ্‌গতি দেবে। স্মরণ রাখুন —

দুরিত জো দূর করেঙ্গে।
পাপী জন ওহী তরেঙ্গে।।

পাপী তরে তো যেতে পারে পরন্তু পাপকে ত্যাগ করে। কেবল প্রার্থনা করলে কিছু পাওয়া যাবেনা বা কেউ তরবে না। প্রার্থনা হল শুদ্ধিকরণের তথা আত্মিক উর্জা প্রাপ্ত করার একটি প্রক্রিয়া। এ হোল অন্যান্য মতের সাথে বৈদিক ধর্মের মূলগত পার্থক্য। প্রার্থনা করার সময় এই বিচারই ভক্তের সামনে হওয়া একান্ত প্রয়োজন। সাধনা মুখ্য হওয়া দরকার, সাধনের প্রাপ্তি গৌণ থাকলেই ভালো।

প্রবুদ্ধ পাঠক মহর্ষি দয়ানন্দের প্রার্থনা — বিষয়ক বিরল পুস্তক "আর্যাভিবিনয়" পড়বেন তো বৈদিক প্রার্থনা ও উপাসনার বিশেষতা তথা অন্য মতবাদের সাথে বৈদিক ধর্মের এতদ্বিষয়ক মৌলিক ভেদ সব ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। এই পুস্তকের পূর্বার্দ্ধে ৪৪ নং প্রার্থনা ঋগ্বেদের একটি মন্ত্রের দ্বারা করা হয়েছে। এই মন্ত্রের অন্তিম শব্দ হল — **"মরুত্বন্তং সখ্যায় হবামহে।"**

এর উপর ঋষি বিনয় করে লিখেছেন —"অতঃ এসো বন্ধুগণ, ভাইয়েরা! নিজস্ব সব সম্প্রীতি দিয়ে মিলিত হয়ে মরুত্বান্ অর্থাৎ পরম অনন্ত বলযুক্ত ইন্দ্র পরমাত্মার সখা হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রার্থনার দ্বারা গদ্গদ্ হয়ে ডাকি তিনি শীঘ্রই কৃপা করে আমাদের সাথে নিজের সখিত্ব (পরম মিত্রতা) করবেন — এতে কোনো সন্দেহ নেই।

বিশ্ব - ইতিহাসে বিগত পাঁচ হাজার বছরে গদ্গদ্ হয়ে পরমেশ্বরকে ডাকার প্রার্থনা কর্তা কোনো মহাত্মা, বিচারক, সুধারক হয়েছে কি? এ নির্ণয় আমরা আমাদের পাঠকদের উপরই ছাড়ছি। ইতিহাস প্রেমী এবং ধর্মপ্রেমী সজ্জন প্রভু যীশুর অন্তিম সময়ের ডাককে বাইবেলে পড়ুন। সেখানে ঈশ্বরের একমাত্র পুত্র যীশুজী পরমপিতাকে উপালম্ভ (গালাগালি) দিয়েছে যে আমাকে কেন ছেড়ে দিয়েছ। পৈগম্বর মোহম্মদজীর অন্তিম বেলার ঘটনাগুলিকে হদীস সমূহে খুঁজে নিবেন।

ঋষি দয়ানন্দজী উপরে যে গদ্গদ্ হয়ে বিনয় করেছেন তা জীবনে প্রয়োগ করে দেখিয়ে দিয়েছেন। বিষপানে তাঁর রোম-রোম ফোঁড়া হয়ে ফুটে উঠছিল। বজ্রসমান তাঁর কুন্দন কায়ার কি হয়েছিল তা পাঠক ঋষি-জীবনকে পড়ে দেখে নিবেন। তা সত্ত্বেও তিনি গদ্গদ্ হয়ে নিজের প্রিয় প্রভুকে বললেন —

"প্রভু! তেরী ইচ্ছা পূর্ণ হো, পূর্ণ হো, পূর্ণ হো।"

সেই বৈদিক আদর্শকে, সেই স্বপ্নকে ঋষিজী সাকাররূপ দিয়ে দিলেন। দুই প্রকারের প্রার্থনাতে মৌলিক পার্থক্য কি? উক্ত ঘটনাতে তা সুস্পষ্টরূপে দর্শিত হয়েছে। কবিরত্ন 'প্রকাশ'- জী লিখেছেন —

জবকি বুঝনে লগা শহর অজমের মেঁ
দেহদীপক দয়ানন্দ ঋষিরাজ কা
তেরী ইচ্ছা হো পূর্ণ ঐ প্যারে প্রভু
বোলকর বাক্য ইয়হ মুস্করানে লগে

মাংসাহারী জন্তু

মাংসাহারী জন্তু কেবল ক্ষুধা লাগলেই মারে, মনোবিনোদের জন্য নয়।

পাপ এবং পাপের ফল

An unduly forgiving god has nothing to prevent Him from becoming at times unduly tyrannous. The latter possibility is simply a corollary from the former presumption."

- Pt. Chamupatiji

অর্থাৎ অনুচিত রূপে ক্ষমা করা পরমাত্মাকে অন্যায়ী বলে অভিহিত করতে কেউ বাধা দিতে পারে না। দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল প্রথমেরই উপসিদ্ধান্ত।

মতবাদীরা মানে যে তাঁদের মান্যতাকে মেনে নিলে মনুষ্যকে পামকর্মের দণ্ড প্রাপ্ত হবে না। মতবাদী বিশ্বাস মাত্র রাখলেই ব্যক্তিকে মোক্ষ অথবা স্বর্গের অধিকারী বলে মনে করে। মত মতান্তরগুলি মনুষ্যদিগকে পাপের ফল থেকে বাঁচানোর আশ্বাসন দেয়। বেদের মান্যতা এ থেকে ভিন্ন। বেদ বলেছে —

'পক্তারং পক্কঃ পুনরা বিশাতি' — অর্থব ১২/৩/৪৮।।

অর্থাৎ মনুষ্য যেমনটি রান্না করে, তেমনটি খায়। বেদের গম্ভীর অধ্যয়ন করলে এটা প্রতীত হয় যে বেদানুসার সৃষ্টির সব থেকে বড় সিদ্ধান্ত হল কর্মফল। একে কর্মফল সিদ্ধান্ত বা কর্মচক্রবাদ বলতে পারেন।

শ্রী পণ্ডিত সত্যব্রতজী সিদ্ধান্তালংকার লিখেছেন — "ভৌতিক জগতের আধার ভূত নিয়ম হল কার্য-কারণের নিয়ম। একে প্রায়ঃ সবাই জানে। কোনো কার্য এমন হতে পারে না যাঁর কোনো কারণ না হবে। যে কার্যের কারণ নাই তা কার্য নয়; যে কারণের কার্য নাই তা কারণ নয়। এটাই কার্য কারণ নিয়ম যখন ভৌতিক জগতের স্থানে আধ্যাত্মিক জগতে কার্য করতেথাকে তখন একে কর্মের সিদ্ধান্ত বলা হয়। কার্য কারণের ভৌতিক নিয়মের আধ্যাত্মিক রূপ-ই হল কর্ম।" (আর্য সংস্কৃতির মূল তত্ত্ব)

এই কর্মফল সিদ্ধান্তের সত্যতার এঁর থেকে বড় প্রমাণ কি যে প্রত্যেক মনুষ্যের কর্মে প্রবৃত্তি আছে। আলসী, মহাআলসী, প্রমাদী সবাই কর্ম করে। কিছু নাই বা করুক — খাওয়া দাওয়া তো করে। এটাও তো একটি কর্ম। যদি কর্ম ফল সিদ্ধান্ত মিথ্যা হত তাহলে কারও কর্মে প্রবৃত্তি না হত। শ্রী তুলসী দাসজী লিখেছেন —

কর্ম প্রধান বিশ্ব করি রাখা
জো জস কটর সো তস ফল চাখা।।

"কৃতং মে দক্ষিণে হস্তে জয়ো মে সব্য আহিতঃ।। অথর্ব ৭।৫০।৮।।

অর্থাৎ কর্ম আমার ডান হাতে এবং বিজয় বাম হাতে। এই সূক্তির ভাবই হল যে ব্যক্তি নিজের কৃতকর্মের ফলের উপভোগ এবং উপযোগ থেকে বঞ্চিত থাকবে না। ব্যক্তি কর্ম করবে এবং তাঁর শ্রমের ফল পাবে না — এটা হবে শোষণ। এটি হবে অব্যবস্থা এবং ভ্রষ্টাচার। কদাচার, শোষণ এবং ভ্রষ্টাচারের বিনাশ কেবল বৈদিক ধর্মের কর্মফল সিদ্ধান্তেরই দ্বারাই সম্ভব।

শ্রী রাজগোপালাচার্য লিখেছেন —

"No act can ever fail to produce its result. Nor can any act produce anything but its true result. It is not possible to do a thing and escape its results." — অর্থাৎ "এটা হতে পারে না যে কোনো কর্ম ফল উৎপন্ন না করবে। না এ সম্ভব যে একটি কর্ম তাঁর বাস্তবিক ফলের পরিবর্তে অন্যকিছু উৎপন্ন করবে। এটি অসম্ভব যে কেউ কর্ম করে তাঁর ফল ভোগা থেকে বেঁচে যাবে।"

মতমতান্তরবাদীর সাথে বৈদিক ধর্মের এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। কর্ম-ফল-সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে কিছু মৌলিক কথার উপর পরে আমরা বিচার করব।

বেদের পবিত্রতার উপর জোর

আমরা পূর্বে বলেছি যে মতবাদীরা এ মানে যে মনুষ্য কোনো ব্যক্তি বিশেষের উপর বিশ্বাস করে বা পূজাপাঠ করে কুকর্মের দণ্ড থেকে বাঁচা যেতে পারে। বেদ পাপ থেকে বাঁচানোর আশ্বাসন তো দেয় কিন্তু পাপের ফল থেকে বাঁচা বা বাঁচানোর তো বৈদিক ধর্মে বা দর্শনে প্রশ্নই উঠে না। বেদ বলছে —

পবিত্রবন্তঃ পরি বাচমস্তে — ঋগ্বেদ ৯।৭৩।৩।।

অর্থাৎ পবিত্রতার ইচ্ছুক বেদের আশ্রয় নেয়।

যজুর্বেদে বলা হয়েছে — 'মাঁ পুনীহি বিশ্বতঃ ১৯।৪৩।।

অর্থাৎ আমাকে সর্বত্র পবিত্র কর।

অথর্ব বেদে বলা হয়েছে — 'অস্মান্ পুনীহি চক্ষসে' — প্রভো! তোর দর্শনের জন্য আমাদেরকে পবিত্র কর। চারবেদে মন, বচন এবং কর্মের পবিত্রতার জন্য হাজার হাজার প্রার্থনা বিদ্যমান আছে। বৈদিক ধর্ম প্রভু প্রাপ্তির জন্য পবিত্রতাকে অতি আবশ্যক মানে এবং পবিত্রতাকে প্রভু দর্শনের ফল বলেও মানে। বৈদিক সিদ্ধান্তকে সুস্পষ্ট করার জন্য আমরা এখানে ঋষি দয়ানন্দের অমর গ্রন্থ সত্যার্থ প্রকাশের একটি প্রমান দেওয়া উপযোগী মনে করছি —

প্রার্থনার ফল

প্রশ্ন — পরমেশ্বরের স্তুতি, প্রার্থনা এবং উপাসনা করা উচিৎ বা উচিৎ নয়?

উত্তর — করা উচিৎ।

প্রশ্ন — স্তুতি আদি করলে পর ঈশ্বর কি তাঁর নিয়ম ভঙ্গ করে স্তুতি, প্রার্থনা করা ভক্তদের পাপ থেকে মুক্ত করে দিবে? উত্তর — না।

প্রশ্ন — তাহলে স্তুতি, প্রার্থনা কেন করা উচিৎ?

উত্তর — তাঁর ফল আরও অন্য কিছু।

প্রশ্ন — কি ফল?

উত্তর — স্তুতিতে ঈশ্বর-প্রীতি, তাঁর গুণ, কর্ম, স্বভাব দিয়ে নিজের গুণ, কর্ম, স্বভাবকে ঠিক করা, প্রার্থনার দ্বারা নিরভিমানতা, উৎসাহ এবং সহায়-র প্রাপ্তি, উপাসনার দ্বারা পরব্রহ্মের সাথে মিলন এবং তাঁর সাক্ষাৎকার হওয়া।

ঋষিজী পুনঃ লিখেছেন —

"প্রশ্নঃ ঈশ্বর তাঁর ভক্তদের পাপকে ক্ষমা করেন বা করেন না?

উত্তর ঃ না, কেননা যদি পাপ ক্ষমা করেন তাহলে তাঁর ন্যায় নষ্ট হয়ে যাবে এবং সব মনুষ্য পাপী হয়ে যাবে।"

প্রভুর কল্যাণী পাবমাণী বেদবাণী এবং মহর্ষির বচনের প্রমাণ দিয়ে আমরা স্পষ্ট করেছি যে বৈদিক ধর্ম পাপের প্রবৃত্তি এবং পাপমার্গ থেকে বেঁচে থেকে পুণ্যকর্ম করার প্রেরণা দেয়। বেদ সর্বদা এই আশ্বাসন দেয় না কি পূজা প্রার্থনা উপাসনার দ্বারা তোমার কৃত পাপ কর্মের দণ্ড তোমাকে প্রাপ্ত হবে না। সংসারে অন্যায় এবং ভ্রষ্টাচারের ব্যাপারটা কী? এই না! কি একজন ব্যক্তি দানবের রূপ ধারণ করে সংসারে উপদ্রব করে অথবা উদন্ডতার মূর্তরূপ হয়ে যায় এবং তাঁকে তাঁর দণ্ড প্রাপ্ত না হয়। অন্যদের অধিকার সমূহের অনাদর করে অনধিকার চেষ্টা অথবা অযোগ্য এবং অদক্ষ ব্যক্তিদের যেটা ইচ্ছা করা-ই ভ্রষ্টাচার।

বেদ যেখানে কর্মফল সিদ্ধান্তকে মান্যতা দেয় সেইখানে এই সিদ্ধান্তের বিরোধী মান্যতা 'ভগবান ভক্তের বশে থাকেন, ভগবান ভক্তদের কুকর্মগুলিকে ক্ষমা করে দেন' ইত্যাদিকে মিথ্যা বলে অভিহিত করেছে। মহর্ষি উপাসনার ফল গুণ, কর্ম এবং স্বভাবের সুধার, নিরভিমান্যতা উৎসাহ তথা সহায়ের প্রাপ্তি বলে দিয়ে মানব জাতিকে আত্মোন্নতি তথা চরিত্র নির্মাণের কল্যাণ-মার্গকে দার্শিয়েছেন। এটাই হল বিশ্বশান্তির মূলমন্ত্র। বেদ বলছে — 'বিশ্বস্য মিষতো বশী' — অর্থাৎ সম্পূর্ণ বিশ্ব সেই প্রভুর বশে বিদ্যমান রয়েছে।

ফারসী ভাষার একজন কবি লিখেছেন — 'বর মন মনিগর বর কর্মে খ্যেশ নিগর" — অর্থাৎ আমার মত কুকর্মীর দিকে দেখবিনা, তুই নিজের দয়াদৃষ্টির দিকে দেখ।

একজন মুসলমান কবি লিখেছেন —

কহ দেঙ্গে সাফ দাবরে মহশর কে রুবরু।

হাঁ হাঁ গুনাহ কিয়ে তেরী রহমত কে জোর পর।।

অর্থাৎ আমরা প্রলয়ের দিনে আল্লাহ্‌কে স্পষ্ট বলেদেব যে আমরা তোর দয়া ও ক্ষমার জোরে যেমন খুশী, যেমন ইচ্ছা পাপ করেছি। সদাচারের কতখানি সুন্দর শিক্ষা?

বিখ্যাত বিচারক, লেখক ও কবি শ্রী অনবর শেখজী এই বিচারধারার উপরই ব্যঙ্গবান মেরে লিখেছেন —

"লাজিম হ্যায় ঝূঠ বোলনা।"

মুর্শদ বলেছেন — "বখশেগা বরনা ক্যায়া খুদা? গুস্সান কীজিয়ে' (বহারে দিল, পৃষ্ঠ ৩৬৭) — এইভাবে মিথ্যা কথা বলা খুদার গৌরবের জন্য, ভক্তদের জন্য আবশ্যক হয়ে গেছে।

এই মলিন, হীন মনোবৃত্তি অগণিত মানবকে পতনোন্মুখ করেছে। এইভাবনাই অনেকের মনে আত্মোন্নতির পবিত্রভাবনাকে উপরে উঠতে দেয়নি। জীবন সুধারের বিচার কেনই বা জাগবে? এই বিচার সদাচারের ভবনের দেওয়ালগুলিতে ফাটল করে দিয়েছে। ঈশ্বরের দয়াদৃষ্টি ও ক্ষমার ভরসাতে মনুষ্য তাঁর আত্মনিরীক্ষন কেই ছেড়ে দিয়েছে। মানুষের চরিত্রও গেল এবং মানবেরা আত্মগৌরব কেও হারিয়ে ফেলল। মানুষের লোক এবং পরলোক দুটোই শেষ হয়ে গেল।

ঋষি দয়ানন্দের মহান উপকার হল যে তিনি এই ভ্রান্তিকে দূর করেছেন যে ঈশ্বর হলেন দয়ালু এবং ন্যায়কারীও। ঋষি লিখেছেন — দয়া এবং ন্যায় পরস্পর বিরোধী গুণ নয়। দুটোর প্রয়োজন একই। যে যতটা খারাপ কাজ করেছে তাকে ততটা দণ্ড দেওয়া উচিৎ। এটা হল ন্যায়। অপরাধীকে দণ্ড না দেওয়া হয় তো দয়ার নাশ হয়ে যায়। দণ্ড দিয়ে অপরাধীকে পাপ থেকে বাঁচানো হল দয়া। অন্যান্যদেরকে তাঁর অত্যাচার থেকে বাঁচানো হল দয়া। এইভাবে ন্যায় এবং দয়াতে নামমাত্র পার্থক্য আছে। ঈশ্বর হলেন দয়ালু, এই দোহাই দিয়ে কেউ কৃতকর্মের ফল থেকে বাঁচতে পারে না। ঈশ্বর ন্যায়কারীও বটে।

জীবের স্বতন্ত্রতা ঃ

জীব কর্ম করাতে স্বতন্ত্র হয়। এটি বৈদিক ধর্মের মান্যতা। অবৈদিক মত জীবকে কর্ম করতে স্বতন্ত্র মানেনা পরন্তু ব্যবহারে বাধ্য হয়ে বৈদিক সিদ্ধান্তের আশ্রয় নেয়। সংসারের সব ভাষাতে এবং সব দেশে ভালো এবং মন্দ এই দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। সব মতবাদী এই দুই শব্দে প্রয়োগ করে। প্রশ্ন হল যে যখন জীবাত্মা কর্ম করতেই স্বতন্ত্র নয় তাহলে ভালো-মন্দের প্রশ্নর প্রশ্ন কোথা থেকে উঠবে?

যদি জীব কর্ম করতে স্বতন্ত্র নয় তো ফের যে কোনও মতের বড় থেকে বড় ব্যক্তি (সংস্থাপকও) — কে ভালো বলা যেতে পারে না। যদি তাঁর (নবী, সংস্থাপক, সন্তলোক) ভালো ছিল তো এঁতে তাঁদের মহানতা কোথায়? যদি আমার তৈরি ঘর সুন্দর হয় তো শ্রেয় ইঁটকে দেওয়া যেতে পারে না। ইঁটের সুন্দরতা তার কারণ নয় অপিতু ইঁটের নির্মাতার কারণ। ভবন সুন্দর হয় নির্মাতার কারণে।

বৈদিক ধর্ম জীবের কর্মস্বতন্ত্রতাকে স্বীকার করে বিশ্বের মানবগণকে দায়িত্বপূর্ণ জীবন ব্যতীত করার প্রেরণা দেয়। বৈদিক নাগরিক নিজের কর্মের জন্য নিজের দায়িত্বকে স্বীকার করে। কর্ম করে তাঁর দায়িত্ব থেকে বৈদিকধর্মী পলায়ন করে না। কর্ম স্বয়ং করা এবং দায়িত্ব ভগবান বা শৈতানের উপর আরোপিত করা এ কায়রতা — পূর্ণ অথবা এ অনৈতিক নীতি বৈদিক ধর্মী আর্যদেরকে সর্বদা অমান্য Responsibility and freedom (দায়িত্ব ও স্বতন্ত্রতা) — এ হল বৈদিক দর্শনের নৈতিক মান্যতাগুলির জীবন। সারা বিশ্বে আচারশাস্ত্র এবং সব দেশের দণ্ড বিধান এই সার্বভৌমিক বৈদিক দৃষ্টিকোণের উপর দণ্ডায়মান রয়েছে। ন্যায়ালয়গুলিতে ন্যায়াধীশ কী বলেন? এটাই না! কি অমুককে এই দণ্ড দেওয়া হচ্ছে কেননা সে অপরাধ করেছে এবং অমুককে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে কেননা সে নিরপরাধী। সে আপত্তিজনক কার্য করেনি। জীবের স্বতন্ত্রতাতে অবৈদিক মতকে মানে লোকেরা বিশ্বাস করুক বা না করুক পরন্তু নিজেদের নিজেদের রাষ্ট্রে শান্তিব্যবস্থা কায়ম রাখার জন্য ন্যায়ালয়েতে মনুষ্যগণকে তাঁদের কৃতকর্মের জন্য দায়ী মেনে দণ্ড দেওয়া হয়। ডা. গোলাম জৈলানী মনুষ্যের কর্ম করার স্বতন্ত্রতাকে খুলাভাবে পক্ষ ধারণ করেন। (দেখুন -দো ইসলাম ২৬৮) এক মুসলমান কবি এই বৈদিক মান্যতার মর্মকে বুঝে নিয়ে মুসলমান তত্ত্বজ্ঞানীদের কাছে ইসলামের উপর কাঁটাফোটার ব্যঙ্গ করে একটি প্রশ্ন করেছেন —

খূব হঁসী আতী হ্যায় মুঝে হজরতে ইন্‌সান পর।
ফেলে বদ তো খুদ করে লানত করে শৈতান পর।।

অর্থাৎ কুকর্ম স্বয়ং করে শৈতানের মাথায় সারা দায়িত্ব চাপিয়ে দেওয়া এ কোথাকার নৈতিকতা? (অনেক শতাব্দী ধরে হাজী লোক শৈতানের উপরে পাথর মেরে চলে আসছে পরন্তু তাঁর কিছু বিগড়ায় না; মনুষ্য অবশ্য বিগড়ে যাচ্ছে।)

ইসলাম তথা খ্রীষ্টান মতে তো জীবের স্বতন্ত্র সত্তা না হওয়ার কারণে জীবের কর্ম করার স্বতন্ত্রতাকে মান্যতা পেতে পারল না পরন্তু হিন্দুদের মধ্যেও বেদ-বিমুখ হওয়াতে এই ভ্রমপূর্ণ বিচার ছড়িয়ে পড়ল যে যা হয় বা করা তা পরমেশ্বরই করে।

আমার এই রকম বিচার যে হিন্দুদের এই পৌরাণিক মান্যতার কারণ পূজারীদের উপবাস (যাঁকে ব্রত বলা হয়), তীর্থযাত্রা ও প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধী কর্মকাণ্ডের বিধান তো বটেই। এঁর দ্বিতীয় কারণ হল নবীন বেদান্তী-ও। উপবাস, যাত্রা ও প্রায়শ্চত্তের পৌরাণিক মান্যতাগুলি সিদ্ধ করে যে ঈশ্বর চায় তো কুকর্মীদের কে পুরস্কৃত করে, নরকগামীদেরকে স্বর্গে এবং স্বর্গবাসীদেরকে নরকে পাঠিয়ে দিতে পারে। এইভাবে জীবের কর্ম করার স্বতন্ত্রতা এক ঢং মাত্র হয়ে থাকে। যখন উপবাসমাত্র করলেই স্বর্গ পাওয়া যেতে পারে, পত্নীর উপবাসে পতির আয়ু বৃদ্ধি হতে পারে, নদী-নালায় স্নান করলে পাপ কাটতে পারে এবং মনোকামনা পূর্ণ হয়ে যায় তাহলে জীবের কর্মসমূহ এবং কর্ম করার স্বতন্ত্রতার কোনো মহত্ত্ব থাকে না।

নবীন বেদান্তে জীবের সত্তাকেই স্বীকার করা হয় না। অতএব জীবের কর্ম-স্বতন্ত্রতার প্রশ্নই উঠে না। পৌরাণিক কীর্ত্তণ করা লোকেরা তালে তাল দিয়ে তালি বাজিয়ে বলে —

"জো বিগড়ে সো তেরা নাথ মেরা ক্যায়া বিগড়ে।"

এই ভাবনার বশীভূত হয়ে গোস্বামী তুলসীদাসজী-ও লিখেছেন।

"কোউ হো নৃপ হমেঁ কা হানি।
চেরী ছোড় ন ভঙ্গ ম্যাঁয় রাণী।।

শ্রীস্বামী বিবেকানন্দ পুরুষার্থ তথা পরমার্থের উপদেশ দেশবাসীকে দিয়েছেন পরন্তু ওঁনার জীবনের নিম্ন ঘটনাতে জানা যায় যে উনিও পৌরাণিক সংস্কারের কুপ্রভাব থেকে পূর্ণরূপেন বাঁচতে পারেননি। 'বিবেকানন্দ চরিত' পুস্তকের লেখক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্র মজুমদার তাঁর উক্ত পুস্তকের (হিন্দী অনুবাদ - ৪র্থ সংস্করণ) পৃষ্ঠা ৪১৯ -এ লিখেছেন— "৩০ ডিসেম্বর স্বামীজী সহসা ক্ষীরভবানীর দিকে চললেন এবং উনি আদেশ দিলেন যে কোন শিষ্য যেন তাঁর পীছা না করে।"

পুনঃ লিখেছেন — 'হোমাগ্নির সম্মুখে যোগাসনে বসে বিকোনন্দ মহামায়ার ধ্যানে মগ্ন হতেই ছিলেন, সেই সময় সমানে ভগ্ন মন্দিরকে দেখে মনে বিচার এল যে যখন মুসমানেরা সেই মন্দিরকে ভেঙে ছিল সেই সময় হিন্দুলোক তাঁদের বাহুবল দিয়ে তাঁদেরকে কি বাধা দিতে পারতো না? যদি আমি সেই সময় উপস্থিত হতাম তাহলে প্রাণের আশা ত্যাগ করে মাতার মন্দিরকে রক্ষা করতাম, কোনোরকম পবিত্র মন্দিরের বিনাশ হতে দিতাম না।" "কিন্তু সহসা উনি দেববাণী শুনলেন। নিজের কানদিয়ে

শুনলেন জগজননী সস্নেহ ভর্ৎসনার সাথে বলছেন যে যদি মুসলমানেরা আমার মন্দিরকে বিধ্বংস করে প্রতিমাকে অপবিত্র করেও দিয়েছে তাতে তোর কী? তুই আমার রক্ষা করিস বা আমি তোর রক্ষা করি?"

পুনঃ লিখেছেন যে পরের দিন স্বামীজী সংকল্প করলেন যে আমি ভিক্ষা চেয়েও ঐ মন্দিরেরর সংস্কারের সংকল্প পুরা করব পরন্তু পুনঃ দেববানী হল – "জননী বললেন যে যদি আমার ইচ্ছা হয় তাহলে কি আমি সাততলা অট্টালিকা যুক্ত সোনার মন্দির এই মুহূর্তে তৈরী করতে পারি না? আমার ইচ্ছাতেই এই মন্দির ভগ্ন হয়ে পড়ে রয়েছে।" লেখক এই দেববানীর উপর লিখেছেন যে এই ঘটনাতে — "কর্মযোগীর বিদ্যার অহংকার চূর্ণ হল।" যাই হোক্ না কেন এই ধরণের বিচার গুলিতে রাষ্ট্রের পতন হয়। অবগুণ বাড়ে, কমে না। যখন জগজ্জনী-ই নিজের অপমান স্বয়ং করান তো ফের অন্যায়ী ও পাপী কাকে বলি?

শিখ সম্প্রদায়ে গুরুদের বাণীতে অনেক স্থানে জীবের কর্ম-স্বতন্ত্রতার বৈদিক সিদ্ধান্তকে স্বীকার করা হয়েছে। যথা —

আপে বীজি আপে হী খাহি। (জপুজী)

জ্যাসা করে সু তৈসা পারে, আপ বীজ আপে হী খাবে। (মহলা-১, শব্দ - ৬)

জ্যাসা বীজৈ তৈসা খাবৈ (মহলা- ৪, শব্দ ৫৪)

এই ধরনের স্পষ্ট প্রমাণ হওয়া সত্ত্বেও শিখ সম্প্রদায়ের লোকেরাও নবীন বেদান্তের প্রভাবে এই রাগই আলাপ করে —

"মানুষকে কুছ নহীঁ হাথ
করে করায়ে আপে আপ।"

এই সব বিচার যে কোন দেশের প্রগতিতে সাধক হতে পারে না; বাধক অবশ্যই। আমাদের বিচারে যদি এই দুই লাইনের এই অর্থই নেওয়া হয় যে জন্ম-মৃত্যু ও কর্মের যথাযোগ্য ভোগ হল পরমেশ্বরের ব্যবস্থা, সেই এই কার্য করে, এই কার্য মনুষ্যের হাতে নেই তাহলে হবে তর্ক সঙ্গত। ঋষি দয়ানন্দজী মহারাজ বড় মার্মিক শব্দে লিখেছেন — "যে পরমেশ্বরের পুরুষার্থ করার আজ্ঞা রয়েছে, তাকে যে ভাঙবে, সে সুখ কখনও পারবে না।" (সত্যার্থ প্রকাশ - সমুল্লাস সাত)

বেদাদেশ :

বেদ ভগবানের ঘোষণা : 'কৃতং স্মর' অর্থাৎ হে মনুষ্য! তোর নিজ কৃত

কর্মকে স্মরণ কর। পুনঃ বলেছেন — 'জন্তায়াতা অন প্লসঃ' (ঋক ২/২৩/৯) অর্থাৎ কর্মহীন নষ্ট হয়ে যায়। বেদ কর্ম-মহিমার গান করে বলেছে — ''অকর্মা দস্যুঃ' (ঋক ১০/২২/৮) —অর্থাৎ কর্মহীন, আলসীব্যক্তি হল দস্যু। বেদ বলছে — 'সুকর্মাণঃ সুরুচো' (অর্থব ১৮/৩/২২) —অর্থাৎ ভালো কর্ম যে করে সে যশস্বী হয়। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে বেদ জীবকে কর্ম করতে স্বতন্ত্র মানে। বৈদিক দর্শনানুসারে উন্নতির সব রাস্তা জীবের জন্য খোলা রয়েছে। বেদ উদ্‌বোধক শব্দে বলেছে —

ইতো জয়েতো বি জয় সংজয় জয় স্বাহা। (অর্থব ৮।৮।২৪।।)

হে জীব! তোর এখানে জয় হোক্, ওখানে জয় হোক্, সর্বত্র জয় জয় প্রাপ্ত কর। কিছু লোক বেদের কর্মফল সিদ্ধান্ত এবং পৌরাণিকদের ভাগ্যবাদ, বিধাতার বিধান তথা ঈশ্বরাজ্ঞাকে একই কথা বলে ভাবে না। এটি তাঁদের ভুল। বেদের প্রকাণ্ড বিদ্বান্ শ্রী স্বামী সমর্পণানন্দজীর তাঁর গ্রন্থ 'কায়াকল্প'-এ লিখেছেন।

ভাগ্যবাদ হল কর্মফল সিদ্ধান্তের শত্রু

''ঈশ্বরের সব থেকে বড় শত্রু হল তাঁর এই ভাগ্যবাদী ভক্ত। সে ভুলে যায় যে ভগবান আমাদেরকে বিশেষ অবস্থাতে জন্ম দিয়েছেন। তিনিই আমাদেরকে তাঁর অনুকূল করার শক্তি এবং আদেশ-ও তো দিয়েছেন। হাত, পা, চোখ, নাখ, কান এবং সব থেকে বড় জিনিষ মস্তক। এই সব মূল্যবান সম্পত্তি ভগবান ভাগ্যের সাথে লড়াই করে তাঁকে জীতার জন্যই দিয়েছেন। ভগবান বলেছেন —

দূষ্যা দূষিরসি হেত্যা হেতিরসি মেন্যা মেনিরসি।

আপ্লুহি শ্রেয়াং সমতি। সমম্ ক্রাম (অথর্ব ২।১১।১।।)

অর্থাৎ তুই শস্ত্রগুলিকে কাটবার শাস্ত্র। তুই দূষণসমূহকে দূষিত করা মহাশক্তি। তুই চিন্তাগুলিকে প্রথমেই চিন্তন কর্ত্তা অনাগত বিধাতা। উঠ! যে তোর সাথের পংক্তিতে রয়েছে তাঁদের মধ্যে মিলেজা।

এক আর্য মহামুনি পাণিনিজী প্রাচীন কালে তাঁর গ্রন্ত অষ্টাধ্যায়ীতে একটি সূত্র লিখে দিয়ে বৈদিক দর্শনের এক গূঢ় রহস্যকে মানব মাত্রের হিতের জন্য প্রকাশ করেছেন। সেই সূত্র হল — 'স্বতন্ত্র কর্ত্তা''। কর্ত্তা হল সেই যে হবে স্বতন্ত্র। যে স্বতন্ত্র নয় সে কর্তা নয়।

যেমনটি আমরা প্রথমে লিখেছি যে আজ কেউ জীবের কর্ম স্বতন্ত্রতার বৈদিক সিদ্ধান্তকে মানুক বা না মানুক পরন্তু ব্যবহারে সারা মানব সমাজ বৈদিক

ধর্মের এই সিদ্ধান্তকে স্বীকার করে নিয়েছে। আমি এই কাজটি করেছি। এই বাক্য আমরা প্রতিদিন প্রয়োগ করি। ন্যায়ালয়গুলিতে নির্ণয় দেওয়ার সময় ন্যায়ধীশ লোক পাণিনি মুনির সূত্র "স্বতন্ত্র কর্তা"-র সত্যতার পুষ্টি করেন। সারা সংসারে ন্যায়ধীশ অপরাধীকে দণ্ডিত করার পূর্বে দেখেন যে কুকর্ম, দুষ্কর্ম অথবা অপরাধ-কর্তা এই-ই এবং কর্তাও স্বতন্ত্র। নির্দোষীদের উপর গুলি চালানো সিপাইকে কখনও দোষী মানা হয় না। গুলি মারার আদেশ দেওয়া ব্যক্তিকেই দোষী সাব্যস্ত করা হয়। কারণ সিপাই স্বতন্ত্র কর্তা হয় না।

কিছু কিছু লোকের আপত্তি এটা যে যখন আমাদের বর্তমান জন্ম আমাদের পূর্বজন্মের কর্মের ফল তাহলে জীবের কর্ম করা স্বতন্ত্রতা কোথায় রইল? ফের তো আমরা পরিস্থিতির দাস। আমাদের অধিকার তথা আমাদের স্থান এই সংসারে যখন পূর্ব নিশ্চিত, তো আমরা কী বা করতে পারি? শ্রী ডা. গোকুলচন্দ্র নারংগ এর উত্তরে লিখেছেন — "Rain comes down from the clouds and We can not stop it but we can escape being drenched if we carry good umbrella or take cover. An arrow once shot cannot be recalled but on can avoid being hit by taking cover or opposing a good shield against it. In the same way, the effect of our past Karma is inevitable, but the virtuous energy displayed in this life can, if enough, successfully ward it off or mitigate it. Opportunity, in fact, series of opportunities are available to us. --" (Glorious Hinduism) — এই বক্তব্যের সার হল যে আমরা বর্ষা থেকে বাঁচতে তো পারিনা পরন্তু ছাতা নিয়ে চললে শরীরকে ভিজে যাওয়া থেকে বাঁচতে পারি। তীরকে থামাতে পারি না কিন্তু ঢাল আগে করে নিজেকে বাঁচাতে পারি।

পরিস্থিতি ও অন্তঃস্থিতি

শ্রী স্বামী সমর্পণানন্দজীর কিছু বিচার এই বিষয়ে পেছনে উদ্ধৃত করেছি। উনি এই বিষয়ের উপরেই 'কায়াকল্পে' আর অন্য একটি প্রকরণ লিখেছেন --- "সংসারের সমস্ত দুরাচারী পরিস্থিতির আড়ালে ঘোর থেকে ঘোর অত্যাচার করে পরিস্থিতির দোহাই দিয়ে থাকে। যে স্থান কখনও কর্মফল, প্রারব্ধ, ভাগ্য তথা কলিযুগ নিয়েছিল - সেই স্থান এখন পরিস্থিতি নিয়েছে। এই পরিস্থিতির মানে কি? বিংশ শতাব্দীর কর্মহীন আলসীদের মহাকবচ।" এই পুস্তকে স্বামীজী লিখেছেন — "যেখানে অন্তঃস্থিতি বলবতী হয় সেখানে সুখ ও শান্তি নিবাস করে; যেখানে পরিস্থিতি বলবতী হয় সেখানে

অনীতি. অত্যাচার এবং দুঃখ নিবাস করে। এই জন্য আমাদের মুখ্য ধ্যেয় অন্তঃস্থিতির সুধার হওয়া উচিৎ।"

বৈদিক আশাবাদঃ

শ্রী গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী লিখেছেন ঃ— "Thus Vedic Philosophy is always optimistic. It helps us in always hoping for the better. No eternal hell. No eternal heaven. No eternal doom. The door of bliss is always open." অর্থাৎ বৈদিক দর্শন সদৈব আশাবাদী। এ সর্বদা আমাদিগকে কল্যাণ অথবা শুভপথের আশা বাঁধায়া। না চিরকালীন নরক, না চিরকালীন স্বর্গ। আনন্দর দ্বার, কল্যাণের দ্বার সর্বদা খুলা রয়েছে। এখানে স্মরণ রাখা দরকার যে বৈদিক ধর্ম মুক্তির পরে ফিরে আসার সিদ্ধান্তকে মানে। ঋষি দয়ানন্দের তর্ক সরল এবং স্পষ্ট যে যাঁর আদি আছে, তাঁর অন্ত-ও আছে। যে তৈরি হয়েছে সে নষ্ট হবে। যে ভেঙেছে সে তৈরি হয়েছিল। সীমিত কর্মের জন্য অসীম ফল হতে পারে না। অতঃ জীবাত্মা মোক্ষের আনন্দ ভোগ করার পর অবশ্য ফিরে আসে। এই তথ্যের উপর প্রকাশ বিকীর্ণ করে এক বিদ্বান্ লিখেছেন —"The law of Karma thus does not do away with free will but constitutes the charter of freedom." অর্থাৎ কর্মফল সিদ্ধান্ত কর্তার স্বতন্ত্রতাকে অমান্য মানে না প্রত্যুত এতো স্বতন্ত্রতার অধিকারের একটি চার্টার ঘোষণা পত্র।

এইভাবে আমরা দেখছি যে কর্মফল সিদ্ধান্ত জীবেব স্বতন্ত্র ইচ্ছার অবহেল না করে না অপিতু স্বতন্ত্রতার অধিকার পত্র।

ডাক্টর রাধাকৃষ্ণন ও বৈদিক আশাবাদকে অতি সুন্দর শব্দে বলেছেন — "every saint has a past and every sinner has future." অর্থাৎ প্রত্যেকটি সাধুর একটি অতীত আছে; প্রত্যেক পাপীর একটি ভবিষ্যৎ আছে।

দর্শনে জীবের কর্ম-স্বতন্ত্রতা

কর্তুং অকর্তুং অন্যথা কর্তুং

জীব চায় তো করবে, না চাইবে না করবে এবং চাইবে তো বিপরীত কর্ম করবে। আচার শাস্ত্রে (ETHIS)-র সম্বন্ধ জীবের কর্মের সাথে। যদি জীব কর্ম করতে স্বতন্ত্র নয় তো আচার শাস্ত্রের জন্য বিশ্বে কোনো স্থান নাই।

শ্রী ডারউইন সাহেব বিকাশবাদে প্রাকৃতিক নির্বাচনের সিদ্ধান্তকে রেখেছেন। শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায় লিখেছেন — "Natural Section is a dignified name of struggle for existence or survival. The struggle lies in selection, rejecting the unfavorable and letting live the favorable. (Philosophy of Dayananda. Para - 586)—অর্থাৎ প্রাকৃতিক নির্বাচন সত্তা

বা জীবন-সংঘর্ষের জন্য একটি অতি চমৎকার নাম। সংঘর্ষ হল চয়নে এবং প্রতিকূলের পরিত্যাগ এবং অনুকূলকে কায়েম রাখা।

নির্বাচন ও স্বতন্ত্রতা

পুনঃ লিখেছেন — "All Selection implies struggle, an effort to choose out of two or more things." (Philosophy of Dayanada Par - 586) অর্থাৎ সব প্রকারের নির্বাচনে এক সংঘর্ষ হয়ে থাকে। নির্বাচন হল দুই অথবা দুই থেকে অধিক বস্তুর মধ্যে একটিকে পছন্দ করার নাম। এ থেকে সিদ্ধ হল যে আমরা মানব জীবনের অবলোকন যে কোন দৃষ্টিতে করি না কেন জীবের কর্ম-স্বতন্ত্রতার সিদ্ধান্ত আমাদেরকে মানতেই হয়।

দয়া এবং ন্যায় ঃ এ সম্বন্ধে প্রথমেই কিছু লেখা হয়েছে। ঈশ্বর দয়ালু বা ন্যায়কারী? মতাবাদীদের মধ্যে এ বিষয়েও ভ্রান্তি বিদ্যামান। এই সরল কথা- টিকে জটিল করে দেওয়া হয়েছে।

শ্রীস্বামী সত্যপ্রকাশজী লিখেছেন — "The mercy of god lies in his being just. His justice is the greatest mercy. He is kind to us. Because He is just and merciful both." (A critical study of Philosophy of Dayananda. Paga 197-198 অর্থাৎ ভগবানের দয়া তাঁর ন্যায়ের মধ্যে নিহিত রয়েছে। তাঁর ন্যায়-ই সব থেকে বড় দয়া। তিনি আমাদের উপর দয়া করেন কেননা সেই প্রভু হলেন ন্যায়কারী এবং দয়ালু উভই-ই।

নৈতিক এবং অনৈতিকের মধ্যে পার্থক্য

শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদ উপাধ্যায়জী বড় মার্মিক শব্দে লিখেছেন — "If it is so, then there is no distinction between life and no-life, between a moral being and an unmoral being, between a virtuous man and a sinner." (Philosophy of Dayananda, Para 671) — ভাব হল যে যদি জীব কর্ম করতে স্বতন্ত্র নয় তো ফের জড় এবং চেতনের মধ্যে পার্থক্য কি থাকল? ফের এক নৈতিক এবং অনৈতিক জীবনে পার্থক্য কি? ফের এক সৎকর্মী ধর্মাত্মক এবং এক কুকর্মী দুষ্টের মধ্যে কি ভেদ রইল?

আজ সারা মানবসমাজ শোষণের বিরুদ্ধে চিৎকার করছে। প্রায়ঃ সব দেশ নিজেদের নিজেদের বিধান নিজেদের নাগরিকগণকে শোষণ থেকে বাঁচানোর আশ্বাসন দিয়েছে।

এখানেই কর্মফল সিদ্ধান্তের প্রয়োজন। **কর্ম করার স্বতন্ত্রতাই হল**

নৈতিকতা এবং স্বাধীনতার সিদ্ধান্তের মূল মন্ত্র। এক বিচারক লিখেছেন — "Just as we deem it a charter of freedom that one cannot in law be robbed of the fruit of one's Labour, the law of Karma is the Magna carta of free will." যেমন ভাবে আমরা এই অধিকার পত্র ভাবি কি রাজ্য অধিনিয়মের অনুসারে কোনো ব্যক্তিকে তাঁর শ্রমের ফল থেকে বঞ্চিত করা যেতে পারে না, তেমনি কর্মফল সিদ্ধান্ত হল জীবের কর্ম স্বতন্ত্রতার যশস্বী অধিকার পত্র।

স্বতন্ত্রতা ও নৈতিকতার মধ্যে অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ রয়েছে। স্বামী সত্যপ্রকাশজী লিখেছেন — freedom imposes responsibility — অর্থাৎ স্বতন্ত্রতা উত্তরদায়িত্ব নিয়ে আসে। দুইজনেই হল যমজ।

নবম অধ্যায়
কর্মফলে ব্যবস্থা

"The universe with its beauties and laws and harmonies, is nothing to an idiot mind caged in matter."

— মুনিবর গুরুদত্তজী বিদ্যার্থী

অর্থাৎ জগতের সৌন্দর্য, নিয়মবদ্ধতা তথা পরসম্পরের সামঞ্জস্য প্রকৃতির মধ্যে ফেঁসে থাকা জড় বুদ্ধির জন্য কোনো মহত্ত্বই রাখে না।

জীব হল কর্ম করতে স্বতন্ত্র। আমাদের এই বৈদিক সিদ্ধান্তের পূরক সিদ্ধান্ত হল যে জীব ফল ভোগার জন্য পরতন্ত্র। গীতার নিষ্কর্ম হল এটাই যে কর্ম করা আমাদের অধীন, ফল পাওয়া ঈশ্বরাধীন। ঋষি দয়ানন্দজী মহারাজ সত্যার্থ প্রকাশে এই বিষয়ে উপর প্রকাশ ছড়িয়ে একটি প্রশ্ন উঠিয়েছেন —

প্রশ্ন ঃ জীব স্বতন্ত্র বা পরতন্ত্র?

উত্তর ঃ নিজের কর্তব্য-কর্মে স্বতন্ত্র এবং ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে পরতন্ত্র।

সত্যার্থ প্রকাশে অন্তিমভাগে 'স্বমন্তব্যামন্তব্য প্রকাশ'—এও দেব দয়ানন্দ লিখেছেন — "জীব তাঁর কর্মে স্বতন্ত্র এবং কর্মফল ভোগার জন্য ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে পরতন্ত্র। ঠিক তেমনি ঈশ্বর তাঁর সত্যাচার আদি করতে স্বতন্ত্র।

সত্যার্থ প্রকাশের সপ্তম সমুল্লাসে লিখেছেন —

"নিজস্ব সামর্থের অনুকূল কর্ম করতে জীব স্বতন্ত্র পরন্তু যখন সে পাপ করে থাকে তখন ঈশ্বরের ব্যবস্থাতে পরাধীন হয়ে পাপের ফলকে ভোগে।"

যদ্যাপি অন্যমতের লোকেরা কর্মফল সিদ্ধান্তকে মান্যতা না দেয় তথাপি কোরাণ আদি পুস্তক সমূহে কোথাও কোথাও কর্মফলের অটল নিয়মের উল্লেখ

পাওয়া যায়। এই সব মতসমূহ কর্মফলকে একটি ব্যবস্থা বা নিয়ম বলে মানে না। মানবে কি করে? যদি সৃষ্টিতে মতবাদীরা ব্যবস্থাকে দেখে নেয় তাহলে চমৎকার কোথায় যাবে? যদি চমৎকার না থাকে তো অবৈদিক মত কিভাবে থাকতে পারবে? কোরাণে কোথাও কোথাও কর্মের জন্য দুগুণ তিনগুণ ফল ও দণ্ডের চর্চা রয়েছে। এ থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে কর্মফল কোন ব্যবস্থার রূপে মতবাদীদের কাছে মান্য নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছার উপর সবকিছু নির্ভর করছে।

বেদের ঘোষ হল — "সবিতা সত্যধর্মা" —অর্থাৎ পরমেশ্বরের সৃষ্টি নিয়ম হল অটল। বেদ বলছে — 'সত্যং বৃহৎ ঋতং উগ্রম্' (অথর্ব ১২।১।১।।) অর্থাৎ সত্য এবং ব্যবস্থা এই দুই আচার শাস্ত্র ও সামাজিক সংগঠনের প্রথম দুইটি স্তম্ভ। বেদ আহ্বান করে করে বলছে — "মধুবাতা ঋতায়তে মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ। মাধ্বীর্ণঃ সন্ত্বোষধীঃ ।। ঋক্ ১।৯০।৬।।
ভাব হল যে সংসারে বায়ু, নদী ও ঔষধী তাঁদের জন্যই সুখদায়ী যে ঈশ্বরের ব্যবস্থা (ঋত্)-র অনুসারে চলে।

বৈদিক ধর্মের প্রভুর রচনার অটল নিয়মগুলিতে কেমন অটল বিশ্বাস বিদ্যমান তাঁর একটি সুন্দর প্রমাণ ঋগ্বেদের (১০।১৯০।৩) নিম্ন মন্ত্রে উপলব্ধ —

ওতম্ সূর্যচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্বমকল্পয়ৎ।
দিবঞ্চ পৃথ্বীঞ্চান্তরিক্ষ মথো স্বঃ।।

অর্থাৎ যেমন ভাবে প্রথম কল্পে সূর্য, দ্যুলোক, পৃথিবী এবং অন্তরিক্ষ তথা লোক-লোকান্তর রচিত হয়েছে তেমনি এই কল্পেও রচিত হয়েছে। বৈদিক ধর্ম সৃষ্টিকে প্রবাহরূপে অনাদি মানে। সৃষ্টির পূর্বে প্রলয় এবং প্রলয়ের পশ্চাৎ সৃষ্টি — এই ক্রম অনাদি কাল থেকে চলে আসছে। পরমাত্মার এই সৃষ্টির নিয়মও সেইটাই যেটা প্রথমকল্পগুলিতে ছিল। ঈশ্বর তাঁর ব্যবস্থাকে ভঙ্গ করেন না।

শ্রী ডা. সত্যপ্রকাশজী লিখেছেন — "Perhaps lawlessness would have gone more against the theistic conception than the existence of law." —অর্থাৎ সম্ভবতঃ ব্যবস্থার অপেক্ষা অব্যবস্থা আস্তিকবাদী বিচারেরঅধিক বিরোধ করে।

বৈদিকধর্ম ব্যবস্থাকেই জীবনের সৌন্দর্য মানে। মতবাদী এঁর বিপরীত চমৎকারকে কোনো ব্যক্তির আত্মিক শক্তির প্রমাণ মানে। প. চমূপতি লিখেছেন — "মূর্খদের কাছে ধর্মের আধার হল চমৎকার। এটা স্বাভাবিক। ধর্ম ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ থেকে উপরের দিকে সংকেত করে। ধর্মের মুখ্য বিষয় হল আত্মা এবং

পরমাত্মা।"

ঈশ্বরের অটল ব্যবস্থার দিকে সংসারের ধ্যান আকৃষ্ট করে ঋষি মানব সমাজের ভারী উপকার করেছেন। এটি হল তাঁর মহান অবদান। কর্মফল সিদ্ধান্তের মর্মকে হৃদয়ঙ্গম করে ঋষি লিখিত শব্দ "ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন" হল অত্যন্ত সারগর্ভিত।

জৈন আদি মত ও কিছু ইতর লোক সৃষ্টি-নিয়মে তো বিশ্বাস করে কিন্তু কর্মফলদাতা অথবা নিয়ন্তাকে মানে না। এমন ধরণের কিছু লোক প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইনকে বলেছিলেন যে সংসারের কোনে নিয়ন্তা নেই; এ বিশ্ব তাঁর নিজের কার্যক্রমের (Routine) দ্বারা এমনিতেই চলেছে। মহান বৈজ্ঞানিক উত্তরে বলেছিলেন — "The nonsense is not merely nonsense. It is objectionable nonsense." অর্থাৎ এই কথাটি অনর্থক, না কেবল নিরর্থক অপিতু হল আপত্তিজনক নিরর্থকতা। আমাদের পাঠক কল্যাণীবাণী বেদের নিম্ন মন্ত্রের উপর বিচার করুক এবং মহান্ Einstein-র উপরোক্ত বাক্যের সাথে তুলনা করে মিলিয়ে নিন্ — "ঋতং চ সত্যং চাভিদ্বাৎ তপসোऽ ধ্যাজায়ত।" (ঋক্ ১০।১৯।১) অর্থাৎ ঋত্ (ব্যবস্থা) ও সত্যের আবির্ভাব সেই সর্বজ্ঞ এবং ক্রিয়াশীল পরমেশ্বর দিয়ে হয়েছে। সম্ভবতঃ সংসারের কোনোগ্রন্থে ব্যবস্থার (ঋত্) (Law and order) এতখানি চর্চা ও এতটা মহত্ত্ব দেখানো হয়নি যতটা কি মানবধর্ম বেদে দেখানো হয়েছে।

ঋষি দয়ানন্দজী মহারাজের মহান উপকার যে উনি নিজের সর্বস্ব হোম করে বেদের ভেদকে খুলে দিয়েছেন। ঋষির মহান উপকারগুলির মধ্যে একটি এটিও যে তিনি "ঈশ্বরের ব্যবস্থার অধীন" — এই দার্শনিক সূত্র দিয়ে সত্যের প্রকাশ করেছেন।

এই সত্যকেই মহান বৈজ্ঞানিক আইনস্টাইন নিজের উপরোক্ত বাক্যে ব্যক্ত করেছেন।

ঈশ্বরের অটল নিয়মে বিশ্বাসই মনুষ্যকে আশাবাদী, উত্তরদায়ী, সাহসী ও প্রগতিশীল করতে পারে। যখন সৃষ্টি নিয়মের স্থিরতাতেই আমাদের বিশ্বাস নেই তো বিজ্ঞানিক অনুসন্ধান কি করবে? বড় সৌভাগ্যের কথা হল যে, যে কোন মতকে মান্যতা দেয় যে কোনো ব্যক্তি গম্ভীরতাতে সৃষ্টি নিয়মে ফের বদল বা অনিয়মিততাকে মান্যতা দেয় না। যদি সৃষ্টি নিয়মই ভাঙতে লাগে তাহলে আমাদের কৃতকর্মের ফল অনিশ্চিত হয়ে যাবে। ব্যক্তি হতাশ, নিরাশ ও উদাস হয়ে বসে যাবে। অকর্মণ্যতার রাজ্য হয়ে যাওয়াতে দুঃখ ও দারিদ্রতার অখণ্ড শাসন সারা

বিশ্ব ছেয়ে যাবে। শ্রী প. গঙ্গাপ্রসাদজী উপাধ্যায় লিখেছেন — "Everything depends upon change. Whatever happened in the past was due to change. What ever is happening in the present is by chance. Such mentality offers no incentive to man. It makes a man lazy, irresponsible and reckless." (The world as we view it page -14) — অর্থাৎ যা কিছু হচ্ছে এবং যা কিছু হবে সব অকস্মাৎ হচ্ছে, হবে। এই রকম বিচার মানবকে কর্ম-প্রেরণা দিতে পারে না। এ থেকে মনুষ্য প্রমাদী অনুত্তর দায়ী ও ধৃষ্ট হয়। বৈদিক ধর্মের সাথে অন্যান্য মতের এটিও একটি মৌলিক পার্থক্য।

বিচারশীল মানবদিগকে আমরা পূজ্য স্বামী শ্রী সত্যপ্রকাশজীর এই নিম্ন বাক্য হৃদয়সঙ্গম করাতে চাই — "Order would certainly appear to be nature's first law." (A critical study of Philosophy of Dayananda, Page- 205) — অর্থাৎ ব্যবস্থা নিশ্চয়ই হল ঈশ্বরের প্রথম নিয়ম।

শ্রী প. চমূপতিজী এই বিচারের বিবেচনা করে লিখেছেন — "যদি জীবন কেবল মাত্র আকস্মিক ঘটনা সমূহের শৃঙ্খলা হয় তাহলে কেউ সুকর্ম কেন করে? পুরুষার্থ কেন করে? প্রাপ্ত হয় তো তাই যা পরমাত্মা বলে। এবং (অথবা বা) প্রকৃতি এনে দেয়। এই ধারণাতে না বীরতা, না বুদ্ধিমত্তা। (বৈদিক সিদ্ধান্ত)

জীব কেন পাপ করে

প্রায়ঃ প্রশ্ন করা হয় যে জীব পাপ কেন করে? যদি আমরা পাপকরি তাহলে ঈশ্বর আমাদেরকে বাধা কেন দেননি? প্রথমে বলা হয়েছে যে বৈদিক ধর্ম জীবকে কর্ম করতে স্বতন্ত্র মানে। এইজন্য পরামাত্মার বাধা দেওয়ার প্রশ্নই উঠে না। পরমাত্মা জীবের মার্গদর্শনের জন্য, ভালো খারাপের জ্ঞান করানোর জন্য বেদের প্রকাশ দিয়েছেন। হৃদয়ের মধ্যে ব্যাপক ঈশ্বর সদৈব সৎকর্ম করার প্রেরণা দেন। যদি জীব পুনঃ পাপ করে তো ঈশ্বর কেন বাধা হয়ে দাঁড়াবে? সে তাঁর ন্যায় ব্যবস্থা অনুসারে পুনঃ দণ্ড দেবে। যদি পরীক্ষা হলে বসে ছাত্র ঠিক উত্তর না দেয় তো অধ্যাপক কিছুই বলবে না। হ্যাঁ, পরীক্ষার পূর্বে সে জ্ঞান অবশ্যই দেয়। মতমতান্তর এই পশ্নের উত্তর দিতে পারে না যে জীব পাপ কেন করে? তাঁরা তো এটাই মানে যে জীবকে তো পরমেশ্বর তৈরি করছেন। যদি পরমেশ্বর তৈরি করছে পাপী কে তৈরি করেছে? ঋষি দয়ানন্দ এই শংকার বড় সুন্দর উত্তর দিয়েছেন —

"মনুষ্যের আত্মা সত্যাসত্যকে জানে। তথাপি নিজের প্রয়োজনের সিদ্ধি, হঠ, জিদ, দুরাগ্রহ এবং অবিদ্যাদি দোষগুলিকে সত্যকে ছেড়ে অসত্যের দিকে ঝুঁকে যায়।" (সত্যার্থ প্রকাশ ভূমিকা)

বেদ বলেছে —

ক্রত্বঃ সমহ দীনতা প্রতীপং জগামা শুচে।

মৃঢা সুক্ষত্র মৃডয়।। ঋক ৭।৮৯।৩।।

অর্থাৎ জীব নিজের দুর্বলতা, দীনতা অথবা অল্পজ্ঞতার কারণে কর্তব্যমার্গ থেকে দূরে সরে যায়। আত্মিক ও মানসিক নির্বলতাতেই মনুষ্য পতনোনমুখ হয়।

'জীব পাপ কেন করে'- এই জটিল দার্শনিক সমস্যার উত্তর উক্ত মন্ত্রে যা দেওয়া হয়েছে তা হল বেদজ্ঞানের মৌলিক অবদান। ধর্মের এই মর্মকে জেনেই আমরা আমাদের তথা বিশ্বের সুধার ও উপকার করতে পারি।

একটি অন্য ভ্রান্তি

অন্য একটি ভ্রান্তি কিছু লোকের মধ্যে পাওয়া যায় যে ব্যবস্থাই হল বিশ্বের নিয়ন্তা। এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করে স্বামী সত্যপ্রকাশজী লিখেছেন —

"We must number that universe is not run by laws. The running of the universe implies that there is particular law and order."
(A critical study of Philosophy or Dayananda Page 208)

অর্থাৎ আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে ব্রহ্মাণ্ডের সঞ্চালন নিয়মসমূহের দ্বারা হয় না প্রত্যুত ব্রহ্মাণ্ডের কার্য-সঞ্চালন এটি প্রমাণিত করে যে এখানে কিছু বিশেষ নিয়ম ও ব্যবস্থা বিদ্যমান রয়েছে।

এই পুস্তকে ঈশ্বরের সত্তার সিদ্ধির বিষয়কে নেওয়া যেতে পারতো না পরন্তু উপরোক্ত প্রশ্নের উৎপন্ন হওয়াতে প্রসঙ্গবশ এটি লিখে দিই যে রচনার জন্য রচয়িতা থাকা আবশ্যক। এই জগৎ তো নিজে নিজেই পরমানুদের সংযোগে তৈরি হয়নি। এক সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তি মান নির্মাতা ও নিয়ন্তা এই সৃষ্টিকে তৈরি করেছে এবং চালাচ্ছে।

সৃষ্টির স্রষ্টা

"যদি পরমানুদের মধ্যে 'মিলনের স্বভাব' থাকে তো সে কখনও পৃথক হবে না, মিলে থাকবে, যদি তাঁর মধ্যে পৃথক পৃথক থাকার স্বভাব আছে তাহলে তাঁরা কখনও মিলিত হবে না; এইভাবে কোনো বস্তু তৈরি হবে না। যদি তাঁদের মধ্যে কিছুর স্বভাব মিলনের এবং কিছুর পৃথক থাকার স্বভাব থাকে তাহলে যে সব পরমানু গুলির সংখ্যা অধিক হবে, তাঁদের অনুকূলে কার্য হবে অর্থাৎ যদি মিলন স্বভাবযুক্ত পরমানুদের প্রাবল্য হয় তো তাঁরা সৃষ্টিকে কখনও নষ্ট হতে দেবে না। যদি পৃথকস্বভাব যুক্ত পরমানুদের প্রাবল্য হবে তো তাঁরা সৃষ্টিকে তৈরি হতে দেবে না। যদি দুই পক্ষ থেকে সমভাবে খিঁচা খিঁচি হবে তো কোন পক্ষের অন্য

পক্ষের উপর বিজয় প্রাপ্ত করা কঠিন হবে।

বস্তুতঃ সৃষ্টির উৎপত্তি, স্থিতি এবং প্রলয় পৃথক পৃথক তথা মিলনে এটাই সিদ্ধ করে যে এঁর কারণ হল এক চেতন শক্তি।" (আস্তিকবাদ পৃষ্ঠা ১০০, তৃতীয় সংস্করণ)

সৃষ্টি কী?

সৃষ্টি নাম হল প্রকৃতি এবং কর্ম দুইটির মিলন

দশম অধ্যায়

আমরা এবং আমাদের প্রভু

আমরা হলাম প্রভুর এবং প্রভু হলেন আমাদের। এ হল বৈদিক মান্যতা। যদি আমরা না হতাম তো তাঁকে "আমাদের প্রভু' কে বলতো? সেই পরমাত্মা আমাদের মাতা, পিতা, বন্ধু, সখা, পালক এবং বিধাতা। ঈশ্বরের সাথে আমাদের অনেক সম্বন্ধ আছে। এ হল বেদের সিদ্ধান্ত। অনেক বেদ মন্ত্রে এই প্রকারের ভাব প্রাপ্ত হয়। সেই পরম দেবের সাথে আমাদের প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। তিনি আমাদের মাতা, তিনি আমাদের মিত্র তো অন্য কোন কারণে নয়। অন্য কারো কৃপা বা পরিচয় করানোতে স্রষ্টার সাথে আমাদের সম্বন্ধ তৈরি হয়নি। এ আত্মীয়তা সরল, স্বাভাবিক, সহজ এবং আকস্মিক নয়, এ সম্বন্ধ হল অনাদিকাল থেকে।

অতঃ বেদনুসারে প্রভুর ভালোবাসা পাওয়ার জন্য, প্রভুর ভক্তি, ভজন, তাঁর অনুভূতিও সাক্ষাৎকারের জন্য তৃতীয় কোন মাধ্যমের আবশ্যকতা নাই। নিজের মায়ের সাথে দেখা করার জন্য বা পরিচয় করার জন্য বা পরিচয় বাড়ানোর জন্য আমি কোনো প্রতিবেশীর বা কোনো প্রতিবেশীর মায়ের পরিচয়-পত্র নিয়ে কি করব? এঁর কোন দরকার নেই। আমার মায়ের সাথে আমার প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ। এমনিতেই সেই পিতা আমার ভেতরে রয়েছেন এবং আমি এবং আপনি সবাই সেই সর্বব্যাপক পরমাত্মার ভেতরে, ফের তাঁর সাক্ষাৎকারের জন্য কোনো গুরু, পীর অথবা পয়গম্বরের প্রয়োজন-ই নেই। এই বছর (২০০৮) গুরু নানকজীর প্রকাশ বর্ষ (জন্মদিন)-র উপলক্ষে দূরদর্শনে শিখেদের একটি শোভাযাত্রাকে দেখানো হয়েছে। এই শোভাযাত্রার আগে আগে এক শিখ দেবী শ্রীমতী মনজীত কৌর বড় শ্রদ্ধা ও গৌরবের সাথে একথা বলেছিল যে গুরু নানকদেবজীর এই উপদেশ যে প্রভু মিলনের জন্য কোনোও মাধ্যমের তৃতীয় ব্যক্তির দরকার নাই। সেই দেবীর এই কথা হল সত্য। এ হল বেদোক্ত মান্যতা। বৈদিক ধর্মের

সাথে অন্যান্য মতসমূহের এটি একটি মৌলিক পার্থক্য। অনেক লোক ও মতপন্থ এটা মানে যে প্রভুর মিলন কোনো পীর, গুরু বা পয়গম্বর ছাড়া হতেই পারে না। ভারতে গুরু-গোঁড়ামি চালানো লোকেদেরকে অন্যপথে নিয়ে যাওয়ার জন্য অনেক মনমর্জী মন্ত্র ও দোহাকে মুখস্থ করানো হয়। যথা — গুরু বিনাগত নহীঁ, শাহ বিনা পথ নহীঁ।।

অর্থাৎ বিনাগুরু গতি নাই যেমনকি সেঠ ধনবান ব্যক্তি ছাড়া মানসম্মান বাঁচতে পারে না, কাজ চলতে পারে না।

বেদ এতো মানে যে গুণী, বিদ্বান, জ্ঞানী, মনীষী, লোকেদেরকে রাস্তা দোখাক্, উপদেশ দিক্, দুর্গুণ ছাড়িয়ে দিক্ পরন্তু সন্মার্গে যাওয়ার জন্য ব্যক্তিকে স্বয়ং চলতে হবে। শ্রী মহাত্মা বুদ্ধ জীবনলীলা সমাপ্ত হওয়ার পূর্বে একটি মর্মস্পর্শী উপদেশ দিয়েছিলেন — "ভিক্ষুগণ! বুদ্ধ তো কেবল মার্গ দেখানোর জন্য এসেছিল। চলতে হবে স্বয়ং তোমাকে।"

এ হল এক অটল সত্য। যজুর্বেদের একটি মন্ত্রে প্রভুর এইটাই উপদেশ — যে, হে জীব! তুই স্বয়ং-ই তোর মহিমাকে, যশকে বাড়া। তোর সৎকর্মের দ্বারা, পুরুষার্থের দ্বারা, আচরণের দ্বারা, তোর নৌকা পার হয়ে যাবে। প্রভু মিলনও নিজের সাধনার দ্বারাই সম্ভব। প্রভু কোনো খেলনা তো নয় যে গুরু বা পয়গম্বর আমাদের হাতে ধরিয়ে দেবে।

গুরু কি ব্যায়াম করবে তো আমি বলবান নিরোগী হতে পারি? গুরু ভক্তি-ভজন করবে তো আমি ভক্ত হয়ে যাব? গুরুজী সত্যে ও ব্রহ্মচর্য-ব্রতের পালন করবে তো আমি এমতিতেই তাঁর কৃপাতে সত্যবাদী ব্রহ্মচারী হয়ে যাব? গুরু তাঁর নিজস্ব জ্ঞান ও অনুভূতি বললেই কি শিষ্যদের মধ্যে ঢেলে দিতে পারে? কদাপি নয়।

এই ভাবে গুরুর কৃপাতে আধ্যাত্মিক শক্তি প্রাপ্ত হতে পারে না। এঁর জন্য নিজস্ব প্রয়াস চাই। এটি হল বৈদিক ধর্মের একটি মূলভূত এবং বিলক্ষণ শিক্ষা। মতসমূহের এরূপটি নেই। আমি এক ঈশ্বরকেই উপাস্য মানি, তা হলেও ধর্মাত্মা, মোমিন বা মুসমান বলে অভিহিত হতে পারি না এবং না আমাকে মুক্তি এবং স্বর্গ প্রাপ্ত হতে পারে। কেন? কারণ হল একটাই যে কুকর্ম না করলেও আমি সৎকর্মও করেছি পরন্তু মোহম্মদজীকে পয়গম্বর মানি না।

আমি বাইবেলের পর্বতীয় উপদেশের উপর আচরণ করেছি, তা হলেও মাদার টেরেসা তো স্বর্গে পৌছে গেছে পরন্তু সেখানে প্রবেশ পাওয়া লোকেদের

সূচীতে আমার নাম কখনও আসতে পারবে না। কারণ? আমি যীশু কে প্রভুর একমাত্র পুত্র বলে স্বীকার করিনা। একলা প্রভুকে মানলে তো কিছুই হবে না। এই মধ্যস্থ (তৃতীয় ব্যক্তি) বেদ স্বীকার করে না। এটি বেদের সাথে অন্যান্য মতসমূহের একটি মৌলিক পার্থক্য।

ইসলামও ঈশ্বরবাদী হওয়ার ঘোষণা করে এবং খ্রীষ্টান মতও ঈশ্বরবাদী, তা সত্ত্বেও দুই-এর মধ্যে সংঘাত কেন? কোন্ কথার উপর বিবাদ? বিবাদ হল যীশু এবং মোহম্মদের পয়গম্বরীকে নিয়ে এই দুইটির মধ্যে মুক্তি কে দেওয়াতে পারে? এই Mediatorship অর্থাৎ (তৃতীয়ত্ব বা মধ্যত্ব) বেদের কাছে অমান্য।

আরও অন্য একটি দৃষ্টিকোণ নিয়ে বিচার করি আমরা পেছনে চর্চা করে এসেছি যে প্রভু হলেন দয়ালু। ক'বে থেকে? তিনি কৃপালু। ক'বে থেকে? তিনি পালক। ক'বে থেকে? তিনি ন্যায়কারী। ক'বে থেকে? তিনি কুকর্মীকে দন্ড দেন। ক'বে থেকে? তিনি হলেন বিধাতা। কখন থেকে?

এই সব প্রশ্নের উত্তর একটাই। সেটা হল যখন থেকে প্রভু অর্থাৎ অনাদি কাল থেকে। আমরা প্রথমেই বলেছি যে সেইপ্রভু অনাদি কাল থেকে স্রষ্টা, স্বামী, পালক, সঞ্চালক, ন্যায়কারী, দাতা, বিধাতা। কা'কে দিতেন? সে কা'র পালন করে আসছেন? তিনি কা'র উপর দয়া করে আসছেন? কা'কে ন্যায় দিয়ে আসছেন? উত্তর হল জীবগণকে। এইভাবে জীবও অনাদি সিদ্ধ হল। তাহলে কি যিশু, মূসা, মোহম্মদজীও অনাদি কাল থেকেই মুক্তি দাতা বা পয়গম্বর? কদাপি নয়। ফের এঁদের আগমনের পূর্বে ঈশ্বর ও জীবের সম্বন্ধ ছিল কি ছিল না? কি করে ভক্ত এবং ভগবানের উপাসনা চলত? মুক্তির সাধন কিছু ছিল বা ছিল না?

লোকেরা গুরু-গোঁড়ামি চালানোর জন্য অনেক কল্পিত বুদ্ধি বিরুদ্ধ মন্ত্র তৈরী করেছে। যথা এই বিষপূর্ণ ভ্রামক প্রচার করা হয়েছে যে গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু এবং গুরুই সাক্ষাৎ মহেশ্বর। এ সব শ্লোক মনুষ্য রচিত এবং গুরুগণকে প্রসন্ন করার জন্য বা নিজের মনক সন্তুষ্টি দেওয়ার জন্য ভালো কল্পনা হতে পারে পরন্তু এ চরম সত্য নয়। এই জন্য সত্যেতর অন্বেষণে রত জিজ্ঞাসুদেরকে, প্রভুর উপাসকদেরকে বৈদিক ধর্মের সাথে অন্যান্য মতগুলির পার্থক্য বুঝতে হবে যে আত্মা ও পরমাত্মার মাঝখানে কোনো মধ্যস্থ বা তৃতীয় ব্যক্তি নাই।

মনে রাখবেন! যদি মৃতগুরু বা পীর মুক্তি, স্বর্গ দেওয়াতে পারে এবং ঈশ্বরের নিকট পর্যন্ত পৌছাতে পারে তাহলে মৃত সাপের দ্বারা দংশন করালেও ব্যক্তির মরে যাওয়া উচিৎ এবং মৃত সৈনিকের দ্বারা শত্রুর উপর বিজয় প্রাপ্ত করা

উচিৎ। এটা দুর্ভাগ্যই ভাবা উচিৎ যে আজ প্রভুর মহিমা, গুণগান এবং উপাসনার উপর এতখানি জোর দেওয়া হয়নি যতটা কি গুরুদের, পীরদের এবং মুক্তি, মোক্ষকে প্রদান করা আচার্যগণের এবং ভোগাস যোগিদের গুণকীর্তন এবং প্রশংসা করার উপর।

* সাকার — নিকাকার —
নিরাকারের উপর সাকারের শাসন হয় না।
** জ্ঞানের দ্বারা সন্তানাঃ
সান্তরা জ্ঞানের সাথে বাড়ে।

একাদশ অধ্যায়

স্বর্গে কে? নরকে কে?

অন্যমত সমূহের সাথে বৈদিক ধর্মের একটি মৌলিক ভেদ এটা যে স্বর্গে কে যাবে এবং নরকে কে যাবে। বেদানুসার স্বর্গ ও নরক কোনো স্থানবিশেষ নয়। সুখবিশেষে নাম স্বর্গ এবং দুঃখ বিশেষের নাম নরক। পরিবারে পারস্পরিক প্রীতি রয়েছে তো ঘর হল স্বর্গ এবং যদি কেউ কারো কথামত চলে না, কেউ-ই কারো শুনে না তো ঘর নরক। যে রাষ্ট্রে ভ্রষ্টাচার, অনাচার, অনুশাসন হীনতা রয়েছে এবং যেখানে লোকেরা পরিশ্রমী নয়; কামচোর এবং আলসী-প্রমাদী তো এরকম দেশ তো নরক-ই। যেখানে পরস্পর অবিশ্বাস সেই পরিবার হল নরক। এটি হল স্বর্গ এবং নরকের মৌলিক ব্যাখ্যা। এটি হল দেবর্ষি দয়ানন্দের অনুপম অবদান।

বেদ এক অবস্থা বিশেষকে স্বর্গ এবং নরক মানে। এ কোন দেশ বিশেষ বা স্থান বিশেষ নয়। মতবাদীরা এই কল্পনা করে রেখেচে যে স্বর্গে অনেক প্রকার সুখ প্রাপ্ত হবে এবং নরকে তীব্র অগ্নিজ্বালাতে জীব চিরকালের জন্য জ্বলতে থাকবে। এখন তো বুদ্ধিমান্ খ্রীষ্টান, মুসলমান এবং পৌরানিক হিন্দুরাও উক্ত প্রকারের অন্ধবিশ্বাস থেকে মুক্ত হচ্ছেন। মৌলানা ন্যাজ ফতেহপুরী উর্দূভাষার একজন খ্যাতনামা লেখক, কবি এবং পত্রকার ছিলেন। তাঁর নাম উর্দূ সাহিত্যের ইতিহাসে সদা অমর হয়ে থাকবে। তিনি একবার "বশিও কী বাস্তবিকতা' নামক একটি দীর্ঘ লেখা লিখেছিলেন। এঁতে তিনি স্বর্গ-নরকের ইসলামী মান্যতার উপর তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ করেছেন। এই মান্যতার মাননীয় মৌলানা, স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁর থেকেও বড় কঠোর খণ্ডন করেছেন। পৌরানিক, মুসলমান এবং খ্রীষ্টান সবাই এটা মানে যে তাঁদের মত কে যাঁরা মানে তাঁরাই স্বর্গে প্রবেশ পারে। অন্য সবকে নরকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া হবে। এক প্রকারে সব মতমতান্তরের লোকেরা নরকেই তো যাবে।

কারণ এই যে, যে সব লোকেরা নিজস্ব মতানুসারে স্বয়ংকে স্বর্গের অধিকারী বলে নিশ্চিন্তে বসে আছে, তাঁদেরকে অন্য মতবাদীরা নরকে ধাক্কা দিয়ে ফেলবে।

মহাত্মা গান্ধীর আত্মকথার অনুবাদ একজন পূর্ব রাষ্ট্রপতি ডা. জাকির হোসেনের ভাই উর্দুতে করেছে। ইনি সমস্ত দিবঙ্গত মুসলমানদের জন্য 'মরহুম' (যাঁর উপর আল্লাহ্-র কৃপা হয় অর্থাৎ স্বর্গস্থ) শব্দের প্রয়োগ করেছে এবং প্রত্যেক হিন্দু, খ্রীষ্টান এবং পারসী নেতাদের জন্য আঁজহানি (নরকস্থ) শব্দের প্রয়োগ করেছে। গান্ধী স্মারক সমিতি এই বইটিকে ছেপেছে। অনুবাদক কংগ্রেসী মহাশয় লোকমান্য তিলককে, ফীরোজশাহ মেহেতা ও শ্রীদাদাভাই নৌরজী ইত্যাদি সবাইকে নরকে পৌছে দিয়েছে। যদি গান্ধীজী নিজের মৃত্যুর চর্চা মনে কর নিজেই নিজের আত্মকথাতে করাতেন বা করে যেতেন তো এই কংগ্রেসী মুল্লা গান্ধীজীকেও নরকে পৌছে দিত।

মৌলানা মোহম্মদ আলী এবং শৌকত আলী দুই ভাই ছিল। দুইজনেই বড় নেতা ছিল। দুইজনেই গান্ধীজীর বন্ধু ছিল। গান্ধীজীর বেঁচে থাকাতেই এক ভাই গান্ধীজীকে নরকে ঘর তৈরি করে দিয়েছিল। (মক্কাতে হজ করতে গিয়ে মৌলানা মোহম্মদ আলী গান্ধীজীর জন্য প্রার্থনা করেছিল যে হে আল্লাহ! একে মুসলমান করে দাও, না হলে গান্ধী নরকের আগুনে জ্বলতে, পচতে থাকবে। এটি ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে বলা হয়েছে) এর কারণ কি? কারণ এটাই ছিল যে গান্ধীজী 'কল্মা গো' — মুসলমান ছিলেন না।

ঋষি দয়ানন্দের তো এই ঘোষণা যে পাপী যেখানেই থাকুক না কেন এবং যে কোনো মতে থাকুক না কেন, সবাই নরকে যাবে। ধর্মাত্মা, সজ্জন, সদাচারী, সৎকর্মী যে কেউ-ই হোক্ না কেন, যে কোনো মতকে মানুক না কেন, সবাই স্বর্গে যাবে। অর্থাৎ শুভ কর্ম-কর্তা, পরোপকারী, শ্রেষ্ঠ জনকে ঈশ্বর সুখ-ই দেবেন। এ হল বৈদিক ধর্মের সাথে অন্যমতগুলির একটি মুখ্য মৌলিক পার্থক্য।

এখন পূর্বাগ্রহ থেকে মুক্ত হয়ে বিচারশীল লোক নিজের হৃদয়ে হাত রেখে নির্ণয় দেন যে তাঁদেরকে বেদের সিদ্ধান্ত গ্রহণযোগ্য অথবা অবৈদিক মত? বৈদিক ধর্ম তো শ্রেষ্ঠ আচরণকে মহত্ত্ব দেয়। এটাই সুখ-দুঃখের একমাত্র কষ্টিপাথর। সৃষ্টি নিয়মকে লক্ষ্য রেখে জ্ঞানপূর্বক কৃতকর্মই হল সদ্‌কর্ম। এটাই হল শ্রেষ্ঠাচরণ।।

উপাধ্যায় জ্ঞানোদ্যান

** প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইউরোপের এমন দুটি জাতির মধ্যে হয়েছিল

যাঁরা একই মতকে মানতো।

** শক্তির থেকে কম কাজ করলে শক্তি ব্যর্থ যায় এবং শক্তির থেকে অধিক কার্য করলে বিফলতা প্রাপ্ত হয়।

** সিংহ হল জঙ্গলের রাজা পরন্তু সে জঙ্গলকে সেইভাবে ছেড়ে দিয়ে মরে যেমনটি সে জন্মের সময় পেয়েছিল। এঁর বিপরীত মনুষ্য সৃষ্টির রূপকেই বদলে দিয়েছে। সমুদ্রকে পাথর দিয়ে ঘেরে দিয়েছে, পাহাড় কেটে দিয়েছে, নদীর উপর পুল তৈরি করেছে।

** মনুষ্য অল্পজ্ঞ — এক কবি মানবজাতির সমস্ত বিভাগে আলোচনাতে পটু হয় কিন্তু একটা বাঁশের ঝুড়ি তৈরি করতে পারে না।

** ভবিষ্যৎ অদৃষ্ট — ভবিষ্যৎ একটি কুয়াশার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

** তৈরি পদার্থ — সেই ইন্দ্রিয় গুলি যাঁর দ্বারা আমরা জ্ঞান প্রাপ্ত করি এবং সেই পদার্থ যাঁর জ্ঞান আমরা পাই; এই দুটোই তৈরি পদার্থ বলে প্রতীত হয়।

** সুমন-র (ফুল) সম্মান না হোত — যদি সোনার মধ্যে সুগন্ধ হত তো ধনাঢ্য পুরুষ পুষ্পের সম্মান কবে করত?

** বিশাল সৃষ্টি — সৃষ্টির বস্তুসমূহ মনুষ্যকৃত বস্তু সমূহের অপেক্ষা প্রত্যেক দৃষ্টিতে হল বিশাল।

** কার্য কারণ ভাব — কার্যকারণের ভাব অশিক্ষিত জংলী মনুষ্যদের মধ্যেও পাওয়া যায়।

** চেতন কে? — চেতন হল সে যাঁর মধ্যে জ্ঞান এবং প্রযত্নে অর্থাৎ বুদ্ধি এবং শক্তি দুটোই থাকে।

** ভয় ও শ্রদ্ধা — বলবান শত্রু আমাদের হৃদয়ে ভয় উৎপন্ন করতে পারে পরন্তু শ্রদ্ধা উৎপন্ন করতে পারে না।

** আলস্যের কারণ — বিলাসপ্রিয়তা এবং আলস্যের অভ্যাস করতে করতে মনুষ্য পরতন্ত্রতাকেও প্রিয় ভাবতে থাকে।

** ফলের পরতন্ত্রতা — ফলের পরতন্ত্রতা এটি প্রকট করে যে ঈশ্বর তাঁর পাপকে সহ্য করতে পারে না।

** পুণ্যের আধারশিলা — এই স্বতন্ত্রতা যাঁকে লোকেরা 'পাপের বীজ' বলে আসলে সে হল পুণ্যের আধার শিলা।

** আবশ্যকতার নাম দুঃখ — কখনও কখনও মনুষ্য আবশ্যকতা গুলিকে দুঃখ বলে অভিহিত করে।

** প্রয়োগ করে তো — মানুষের শক্তির বিকাশ তখনই হয় যখন শক্তির প্রয়োগ করার আবশ্যকতা পড়ে।

** নিয়মবদ্ধতা — নিয়মবদ্ধতাই হল একতার চিহ্ন।

** কেন? — যদি পরমাণুদের অকস্মাৎ সংযোগে জাজ্বল্যমান সূর্য উৎপন্ন হতে পারে তো ছোট-ধরনের প্রদীপ কেন হতে পারে না?

** নিয়ম — নিয়ম স্বয়ং কোনো কাজ করে না, কোনো নিয়ম স্বয়ং কিছু তৈরি করে না।

** নিয়ন্তা — নিয়ম বিনা নিয়ন্তা কি করে এবং নিয়ন্তাকে ছেড়ে নিয়ম কি করে?

** বিজ্ঞানের আরম্ভ — বস্তুতঃ বিজ্ঞানের আরম্ভ সেই সময় থেকে হতে থাকে যখন থেকে আমরা নিজেদের চোখ, কান খুলে রেখে সৃষ্টির নিরীক্ষণ করতে লাগি।

** যতক্ষন পর্যন্ত চোখ বন্ধ থাকে — স্বার্থ-সিদ্ধি সেই সময় পর্যন্ত হতে পারে যখন অনুযায়ীদের চোখ বন্ধ থাকে এবং তাঁদেরকে স্বাধীনভাবে ভাবার অবসর না দেওয়া হয়।

** পশু অজ্ঞান কেন? — কারণ হল যে সে অন্য অনুমান আদি প্রমাণের দ্বারা যথোচিত লাভ প্রাপ্ত করতে পারে না, না তো শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত করতে পারে।

** ক্রিয়া কোথায়? — যেখানে কর্তা নেই সেখানে কেউই ক্রিয়া-ও করতে পারে না।

** নিমিত্ত কারণ থাকে তো — বস্তুতঃ ক্রিয়া সেই সময়ই পর্যন্ত হয় যতক্ষণ নিমিত্ত কারণ উপস্থিত থাকে।।

ওম্

আর্য্য সমাজের দশ নিয়ম

১। সমস্ত সত্য বিদ্যা এবং যে পদার্থবিদ্যা দ্বারা জানা যায় সে সকলের আদিমূল পরমেশ্বর।

২। ঈশ্বর সচ্চিদানন্দস্বরূপ, নিরাকার, সর্বশক্তিমান, ন্যায়কারী দয়ালু, অজন্মা, অনন্ত, নির্বিকার, অনাদি অনুপম, সর্বাধার, সর্বেশ্বর, সর্বব্যাপক, সর্বান্তর্যামী, অজর, অমর, অভয়, নিত্য পবিত্র ও সৃষ্টিকর্তা তাঁহারই উপসনা করা উচিৎ।

৩। বেদ সমস্ত সত্য বিদ্যার পুস্তক, বেদের পঠন পাঠন ও শ্রবণ শ্রাবণ সমস্ত আর্য্যের পরম ধর্ম।

৪। সত্য গ্রহনে ও অসত্য পরিত্যাগে সদা উদ্যত থাকিবে।

৫। সমস্ত কার্য্য ধর্মানুসারে অর্থাৎ সত্য অসত্য বিচার করিয়া করিবে।

৬। সংসারের উপকার করা এই সমাজের মুখ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ শারীরিক, আত্মিক ও সামাজিক উন্নতি করা।

৭। সকলের সহিত প্রীতি পূর্বক ধর্মানুসারে যথাযোগ্য ব্যবহার করিবে।

৮। অবিদ্যার নাশ ও বিদ্যার বৃদ্ধি করিবে।

৯। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের উন্নতিতে সন্তুষ্ট না থাকিয়া সকলে উন্নতিতে নিজের উন্নতি জ্ঞান করিবে।

১০। সকল মনুষ্য সামাজিক সর্বহিতকারী নিয়ম পালনে পরতন্ত্র থাকিবে এবং প্রত্যেক হিতকারী নিয়ম পালনে সকলে স্বতন্ত্র থাকিবে।

বৈবচারিক ক্রান্তির জন্য সত্যার্থ প্রকাশ পড়ুন

পুস্তক প্রাপ্তিস্থান ঃ—

আর্য্যসমাজ — সাহসপুর, ইন্দাস, বাঁকুড়া
মোঃ- ৯৪৭৬১২৭৮৭৬, ৯৭৩২৩১৩৮১১

আর্যসমাজ মন্দির — ১৯, বিধান সরণী, কোলকাতা - ৬
ফোন ঃ- ২২৪১ ৩৪৩৯

বঙ্গীয় আর্য প্রতিনিধি সভা — মহর্ষি দয়ানন্দ ভবন, ৪২, শঙ্কর ঘোষ লেন, কোল-৬
ফোন ঃ- (০৩৩) ২২৪১ ৪৫৮৩

মহাত্মা প্রেমভিক্ষু — বাসুদেবপুর, ধারেন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর
মোঃ- ৯৪৩৪৩৬৯৮২৬

মুদ্রণে ঃ- যমুনা প্রিন্টিং, ইন্দাস (গার্লস্ স্কুলের পাশে), মোঃ- ৯৪৩৪৫২০১০৬